গীতাঞ্জলির ভাবধারা

শ্রীকৃষ্ণ বিহারী গুপ্ত

মূল্য ১৲

উৎসর্গ

রায় বাহাদুর

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ মিত্র মহোদয়

ভক্তিভাজনেষু—

ভূমিকা

এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট প্রবন্ধগুলি অনেক বৎসর পূর্ব্বে বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। কবি-বন্ধু শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় কবিশেখর ও সোদরোপম শ্রীমান্ রাধেশ রায় এই গ্রন্থ প্রকাশে আমাকে নানা ভাবে বিশেষ রূপে সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য আমি তাঁহাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

ভাগলপুর।
৩০শে শ্রাবণ, ১৩৪৭।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

সূচী

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

কাব্যমাত্রই প্রধানতঃ রসাত্মক বাক্য ; সুতরাং কোন কাব্যকে রসের দিক হইতে বিচার না করিয়া যদি তাহার মধ্যে আমরা তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে শুধু যে কবির প্রতি অবিচার করা হয় তাহা নয়, কাব্যোপভোগেও আমরা অনধিকারী তাহাই প্রমাণিত হয়। তাই ম্যাথু আর্নল্ড ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের কাব্যসমালোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, তাহার যদি কোন ফিলজফি থাকে, তবে তাহাই তাঁহার কাব্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ নহে, তাহার কাব্য-সৌন্দর্য্যই সকলের সমধিক উপভোগ্য। এ কথা সকল কবির সকল শ্রেষ্ঠ কাব্য সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে।

কিন্তু যে কাব্য বা গান ভগবদ্‌বিষয় অবলম্বন করিয়া রচিত, তাহার মধ্যে তত্ত্বের প্রাধান্যলাভের সম্ভাবনা আছে—বিশেষতঃ সেই সকল দেশে যেখানে ভগবানকে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ক্রীড্‌ বা অনুশাসনের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফেলা হইয়াছে। এই কারণেই ইংরেজি সাহিত্যে ভগবদ্‌বিষয়ক কবিতা শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারে নাই। কাউপারের Olney Hymns

অপাঠ্য, এমন কি মিল্‌টনেরও বিরাট কল্পনা যখনই থিয়লজির আবর্ত্তে পড়িয়া ঘূর্ণিপাক খাইয়াছে, তখনই তাহা পঙ্গুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। প্যারা-ডাইস্‌ লষ্টে অনেক স্থলে ইহার উদাহরণ পাওয়া যাইবে। একমাত্র ব্লেকেই ইহার ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়।

হিন্দু-সভ্যতার বিশেষত্ব এই যে, এখানে ভগবানকে তত্ত্ব বা মতের গণ্ডীর মধ্যে বাঁধিয়া ফেলা হয় নাই। ভগবৎতত্ত্ব বা দর্শনের প্রচার যে এখানে হয় নাই তাহা নহে। কিন্তু মানবের ব্যক্তিগত জীবনে ভগবান ভক্তি ও অনুভূতির সামগ্রীই হইয়া আছেন, তত্ত্ব বা দর্শনের নহে। শুধু তাহাই নহে। হিন্দু পরমেশ্বরকে মানবজীবন ও বিশ্বপ্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেখে না। তিনি যেমন জলে স্থলে গ্রহনক্ষত্রে ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন, তেমনই আবার মানবের দৈনন্দিন জীবনে—তাহার সুখে দুঃখে, প্রেমে বিরহে—তিনিই নিজেকে বিচিত্রভাবে প্রকাশ করিতেছেন। তাই হিন্দু কবি যখন মানবজীবন লইয়া কাব্য রচনা করিতে বসেন, তখন ভগবানকে ভুলিয়া থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে; আর হিন্দু সাধক যখন ভক্তির প্রবল বেগে চালিত হইয়া উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে ভগবন্‌মহিমা কীর্ত্তন করিতে থাকেন, তখন তাঁহার সেই গানের মধ্যে সমগ্র বিশ্ব ও মানব প্রতিবিম্বিত হইয়া পড়ে। তাই হিন্দুর পারমার্থিক কাব্য ও গান জগতের সাহিত্যে অতুল। কারণ, তাহা একাধারে শ্রেষ্ঠ কাব্য ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মসাহিত্য। কবীর, মীরাবাঈ, তুকারাম, তুলসীদাস, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রামপ্রসাদ—ইঁহাদের উদ্ভব ভারতবর্ষেই সম্ভব হইয়াছে।

সুতরাং তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিতে গেলে রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলিতে

আমাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহা হয়ত এমন-কিছু নূতন নহে। হিন্দুর যে ধর্ম্মসাধনা উপনিষদে ও গীতায় চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে, শাক্ত ও বৈষ্ণবের ভক্তিগদ্‌গদ্‌ গান ও কোমলকান্ত পদাবলীতে যাহার স্রোত কতশত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালা জাতিকে ডুবাইয়া রাখিয়াছে, তাহারই একটি ধারা নবরবিকিরণসম্পাতে অপূর্ব্ব আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া হিন্দুর চিরন্তন আনন্দবার্ত্তা বহন করিয়াই রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। তাই বোধ হয় বাঙ্গালীর নিকট গীতাঞ্জলি ততটা অপূর্ব্ব বলিয়া বোধ হয় নাই যতটা হইয়াছে পাশ্চাত্য দেশে। কারণ, পাশ্চাত্য জাতিসমূহ এই প্রেম ও আনন্দের গানে এমন একটি রসের সন্ধান পাইয়াছে, অনাবিল কাব্য-সৌন্দর্য্য ও আন্তরিক ভক্তিভাবের এরূপ এক অপূর্ব্ব সমন্বয় দেখিয়াছে, যাহা তাহাদের নিকট যে কেবল সম্পূর্ণ অভিনব বলিয়া বোধ হইয়াছে তাহা নহে, তাহাদের ভোগোন্মত্ত অশান্ত প্রাণের সম্মুখে শান্তি ও আনন্দের দ্বার খুলিয়া দিয়াছে। ইহার তুলনা খুঁজিতে তাহাদিগকে মধ্যযুগের টমাস-এ-কেম্পিস, ফ্রান্সিস্‌-এসিসি প্রভৃতি ভক্তদের কথা স্মরণ করিতে হইয়াছে; কেহ কেহ ডেভিডের গান ব্যতীত ইহার সহিত তুলনা করিবার আর কিছু খুঁজিয়া পান নাই। একজন লেখক আমেরিকার একখানি বিখ্যাত পত্রে গীতাঞ্জলির সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখিলেন, রবীন্দ্রনাথ কাব্য ও আধ্যাত্মিকতার যেরূপ চমৎকার মিলন সাধন করিয়াছেন, পাশ্চাত্য দেশের কোন কবিই এ পর্য্যন্ত সেরূপ পারেন নাই—মিল্টন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, এমন কি ডান্টে পর্য্যন্ত না। (North American Review for May, 1913)

কিন্তু আমাদের চক্ষে গীতাঞ্জলির নূতনত্ব এত বেশী না হইলেও, ইহা

যে কবির সারা জীবনের একনিষ্ঠ কাব্যসাধনারই পরিণতি তাহা সকলকে স্বীকার করিতেই হইবে। সুতরাং ইহার মূল উপনিষদের ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় নিহিত থাকিলেও ইহা এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু, এ-কথাও ভুলিলে চলিবে না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা গীতাঞ্জলির এই বিশেষত্বটুকুই আলোচনা করিব। এবং সে বৈশিষ্ট্য ইহার অন্তর্নিহিত ভাবধারায় কিরূপ প্রকটিত হইয়াছে তাহাও দেখাইতে চেষ্টা করিব।

গীতাঞ্জলির পাঠকমাত্রেরই সর্ব্বাগ্রে যাহা চক্ষে পড়ে, তাহা হইতেছে কবির অসাম্প্রদায়িকতা। যদিও হিন্দুর ধর্ম্মসাধনা কখনও কোন বিশেষ ক্রোড়ে গণ্ডীবদ্ধ হয় নাই, তথাপি বিভিন্ন সাধক এক-একটি নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া সাধন-পথে অগ্রসর হইয়াছেন। বৈষ্ণবের মধুর ভাব কিংবা শাক্তের জগন্মাতা কালীতারা-রূপ-কল্পনা একই সাধারণ ভাবের অভিব্যক্তি হইলেও স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের ভাবেই বিশিষ্টরূপে ভাবুক; কিন্তু তাহা হইলেও ভক্তির এই বিভিন্ন ধারাও তাঁহার নিজস্ব ধারার সহিত মিলিত হইয়া এমনই এক উদার ভাব-স্রোতের সৃষ্টি করিয়াছে যে, তাহা অঞ্জলিপুটে পান করিয়া সকল ধর্ম্মের সকল সম্প্রদায়ের ভক্ত তৃপ্ত হইতে পারে। তিনি একাধারে বৈষ্ণব, শাক্ত ও বৈদান্তিক, এবং একজন খৃষ্টানও স্বধর্ম্মমতের অনুকূল অনেক ভাব ইহার মধ্যে দেখিতে পাইবেন। কিশোর 'ভানুসিংহ' প্রৌঢ় সীমায় উপনীত হইয়াও যে বৈষ্ণব-প্রীতি হারান নাই তাহার প্রমাণ গীতাঞ্জলির অনেক গানেই রহিয়াছে। শ্রাবণে মেঘের দিনে সকলের অন্তরতম ধন যখন নিশার মত নীরবে সবার দিঠি এড়াইয়া পথিকহীন পথের পরে বাহির হন, কবি তখন তাঁহাকে আপনার কুঞ্জকুটীরে আহ্বান করেন—

হে একা সখা, হে প্রিয়তম, রয়েছে খোলা এ ঘর মম,
সমুখ দিয়ে স্বপন সম
যেয়ো না মোরে হেলায় ঠেলে।

'মেঘৈমেদুর' অম্বর রাধার অভিসারের সহায় হইয়াছিল। এখানেও দেখি, যখন 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে, আঁধার ক'রে আসে' তখন কবি তাঁহারই আকুল প্রতীক্ষায় 'একা দ্বারের পাশে' বসিয়া আছেন।

তুমি যদি না দেখা দাও, কর আমায় হেলা,
কেমন করে' কাটে আমার এমন বাদল বেলা!

আবার 'ঝড়ের রাতে' তিনি অভিসারে বাহির হইয়াছেন জানিতে পারিয়া কবি তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছেন।

নাই যে ঘুম নয়নে মম, দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম,
চাই যে বারে বার।
পরাণ-সখা বন্ধু হে আমার!

কখনও বা গভীর রাতে নিদ্রামগ্ন ভক্তের পাশে নীরবে তিনি আসিয়া বসেন। ভক্ত তাহা জানিতে পারেন না। পরে যখন, 'জেগে দেখে দখিন হাওয়া পাগল করিয়া, গন্ধ তাহার ভেসে বেড়ায় আঁধার ভরিয়া', তখন বুঝতে পারেন কে আসিয়াছিলেন, আর তাঁহাকে যে পাইয়াও পাইলেন না, এই দুঃখে তিনি রাধার ন্যায় নিজেকে ধিক্কার দিয়া গাহিতে থাকেন—

সে-যে পাশে এসে বসেছিল তবু জাগিনি।
কি ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনী।
এসেছিল নীরব রাতে বীণাখানি ছিল হাতে,
স্বপন মাঝে বাজিয়ে গেল গভীর রাগিণী।

আবার যখন দিনের অবসানে ধরণীতে সাঁঝের ছায়া নামিয়া আসে, তখন 'জলধারার কলস্বরে সন্ধ্যাগগন আকুল করে', আর 'বিজন পথে করে না কেউ আসা-যাওয়া', তখন তিনি রাধারই ন্যায় 'কলসখানি ভরে নিতে' ঘাটে যান। তখন তাঁহার 'প্রেমনদীতে উঠেছে ঢেউ উতল হাওয়া'; কারণ, 'ঘাটে সেই অজানা বাজায় বীণা তরণীতে।'

গীতাঞ্জলিতে রাধাকৃষ্ণের রূপক স্পষ্টভাবে রক্ষিত না হইলেও ইহার মধ্যে বৈষ্ণব-প্রভাবের অন্তঃপ্রবাহ যে কিরূপ বহিয়া চলিয়াছে তাহা উপরের উদাহরণগুলি হইতেই বিশেষরূপে উপলব্ধ হইবে। আবার শাক্ত সাধকের ন্যায় তিনি ভগবানকে জননীরূপেও আহ্বান করিয়াছেন—

তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ দুখের অশ্রুধার,
জননী গো, গাঁথ্‌ব তোমার গলার মুক্তাহার।

অন্যত্র তিনি আবার জননীর প্রসাদ লাভ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছেন।—

জননি, তোমার করুণ চরণখানি
হেরিনু আজি এ অরুণ-কিরণ-রূপে।

কিন্তু এইসব ভাবধারার অপেক্ষাকৃত ক্ষীণধ্বনি ডুবাইয়া দিয়া যে সুর গীতাঞ্জলির অধিকাংশ গানের মধ্যে বাজিতেছে, তাহা হইতেছে উপনিষদের আনন্দের সুর—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি—রসো বৈ সঃ—ভগবানকে আনন্দময় রূপে হৃদয় মধ্যে নিবিড়ভাবে অনুভব করিবার জন্য ভক্তপ্রাণের আকৃতি ও আকুলতা। এই একটিমাত্র ভাব গীতাঞ্জলির মধ্যে নানা আকারে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

ভগবানের আনন্দরূপের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গদ্য প্রবন্ধে একস্থলে বলিতেছেন,—"তিনি বাক্যের ও মনের অতীত। কিন্তু অতীত হইয়া রহিলেন কৈ ? এই যে দশ দিকে তিনি আনন্দরূপে আপনাকে একেবারে দান করিয়া ফেলিতেছেন। তিনি ত লুকাইলেন না। যেখানে আনন্দে অমৃতে তিনি অজস্র ধরা দিয়াছেন, সেখানে প্রাচুর্য্যের অন্ত কোথায়, সেখানে বৈচিত্র্যের যে সীমা নাই, সেখানে কি ঐশ্বর্য্য, কি সৌন্দর্য্য! সেখানে আকাশ যে শতধা বিদীর্ণ হইয়া আলোকে আলোকে নক্ষত্রে নক্ষত্রে খচিত হইয়া উঠিল, সেখানে রূপ যে কেবলই নূতন নূতন, সেখানে প্রাণের প্রবাহ যে আর ফুরায় না। তিনি যে আনন্দরূপে নিজেকে নিয়তই দান করিতে বসিয়াছেন।"

এই ভাবই গীতাঞ্জলির অনেক গানে অভিব্যক্ত হইয়াছে। একটিতে তিনি বলিতেছেন—

> প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে
> প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোক ভূলোকে
> তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া।
>
> দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ
> মুরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ,
> জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া।

কিন্তু দিকে দিকে ভগবানের এই আনন্দ-মূর্ত্তির প্রকাশ সত্ত্বেও অবসাদগ্রস্ত মানব-জীবন সকল সময় ত 'নিবিড় সুধায়' ভরিয়া উঠে

না, আনন্দের এই অনন্ত প্রবাহ এই হৃদয়কে ত প্লাবিত করিতে পারে না। তাহা হইলে আর তাঁহার দর্শন লাভ হইল কৈ? তাই কবি নৈরাশ্যপীড়িত হৃদয়ে গাহিতেছেন।

জগৎ জুড়ে উদাস সুরে আনন্দ-গান বাজে,
সে গান কবে গভীর রবে বাজিবে হিয়া মাঝে?

* * *

রয়েছ তুমি এ-কথা কবে জীবন মাঝে সহজ হবে,
আপনি কবে তোমারি নাম ধ্বনিবে সব কাজে?

প্রাণে যখন এই ব্যাকুলতা জাগিয়া ওঠে, তখন আর তাঁহাকে চিনিতে বিলম্ব হয় না। তখনই মানুষ সত্যসত্যই বুঝিতে পারে—

এই যে তোমার প্রেম ওগো হৃদয়হরণ!
এই যে পাতায় আলো নাচে সোনার বরণ।
এই যে মধুর আলসভরে মেঘ ভেসে যায় আকাশ পরে,
এই যে বাতাস দেহে করে অমৃত ক্ষরণ,
এই ত তোমার প্রেম ওগো হৃদয়হরণ।

ভগবানের আনন্দময়ত্বের সঙ্গে যে ভাবটি অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংপৃক্ত রহিয়াছে, তাহা বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যে ভগবানের বিচিত্র বিকাশ ও অনন্তরূপ দর্শন। ইংরেজিতে ইহাকে Pantheistic Nature-worship বলা যাইতে পারে। তিনি প্রকৃতির সহিত একাত্মক হইয়া সর্ব্বত্র

বিরাজ করিতেছেন। সুতরাং প্রকৃতি-পূজাতেই তাঁহারই পূজা। তাই দেখি কবি কখনও শারদলক্ষ্মীকে আহ্বান করিতেছেন—

এস গো শারদ লক্ষ্মী তোমার শুভ্র মেঘের রথে,
এস নির্ম্মল নীল পথে,
এস ধৌত শ্যামল আলোঝলমল বন-গিরি-পর্ব্বতে,
এস মুকুটে পরিয়া শ্বেত-শতদল শীতল-শিশির-ঢালা।

আবার কখনও বা বর্ষার জলভারাবনত মেঘের আবাহন গাইতেছেন—

এস হে এস সজল ঘন বাদল বরিষণে,
বিপুল তব শ্যামল স্নেহে এস হে এ জীবনে।

এই সসীম প্রকৃতিরাজ্যের রূপসাগরের মধ্যে সেই অসীম সেই অরূপ রতনের সন্ধান করিতে হইবে।

রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করি।
ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী।

গেটে যখন বলিয়াছিলেন, 'Would you penetrate into the Infinite then press on every side into the Finite' তখন তিনি এই তত্ত্বই বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন। আমাদের কবি যাঁহাকে

তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে
এস গন্ধে বরণে এস গানে

বলিয়া আবাহন করিতেছেন তিনি অরূপ হইলেও তাঁহার রূপের লীলা

যে 'কত বর্ণে কত গন্ধে কত গানে কত ছন্দে' প্রকটিত হইতেছে তাহার কি ইয়ত্তা আছে? সারা বিশ্বজগৎ ব্যাপিয়া রূপ ও অরূপের এই বিরহ-মিলনের লীলা নিরন্তর অভিনীত হইতেছে।

মানবজীবনেও এই সত্যই অন্যরূপে প্রকটিত হইতেছে। ক্ষুদ্র মানুষের হাসি-কান্না স্নেহ-প্রেম সেই অসীমেরই আভাস আনিয়া দেয়। এখানেও এই সীমার মধ্যে সেই অসীমেরই লীলা চলিতেছে।

সীমার মধ্যে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর;
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর॥

গীতাঞ্জলিতে এই যে ভাবটা প্রকাশ পাইয়াছে, কবি বলেন ইহাই তাঁহার সমগ্র কাব্যসাধনার মূলে রহিয়াছে। 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি লিখিতেছেন,—"আমার ত মনে হয় আমার সমস্ত কাব্যরচনার এই একটিমাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা।" অতি অল্প বয়স হইতেই এই ভাবটি কবির হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। তাঁহার প্রথম যৌবনে রচিত 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নামক নাট্য-কাব্যের অন্তর্নিহিত ভাবও ইহাই। "এই কাব্যের নায়ক সন্ন্যাসী সমস্ত স্নেহ-বন্ধন মায়া-বন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রকৃতির উপর জয়ী হইয়া একান্ত বিশুদ্ধভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিল। অনন্ত যেন সব কিছুরই বাহিরে। অবশেষে একটি বালিকা তাহাকে স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়া অনন্তের ধ্যান হইতে সংসারের মধ্যে ফিরাইয়া আনে। যখন ফিরিয়া আসিল তখন সন্ন্যাসী ইহাই দেখিল—ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ,

সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি। প্রেমের আলো যখনি পাই তখনি যেখানে চোখ মেলি সেইখানেই দেখি সীমার মধ্যেও সীমা নাই। * * * প্রকৃতির প্রতিশোধের মধ্যে একদিকে যত সব পথের লোক, যত সব গ্রামের নরনারী—তাহারা আপনাদের ঘরগড়া প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্যে অচেতনভাবে দিন কাটাইয়া দিতেছে; আর একদিকে সন্ন্যাসী, সে আপনার ঘরছাড়া এক অসীমের মধ্যে কোনোমতে আপনাকে ও সমস্ত কিছুকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রেমের সেতুতে যখন এই দুই পক্ষের ভেদ ঘুচিল, গৃহীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর যখন মিলন ঘটিল, তখনি সীমায় অসীম মিলিত হইয়া সীমার মিথ্যা তুচ্ছতা ও অসীমের মিথ্যা শূন্যতা দূর হইয়া গেল।"

এই যে প্রেমের পথ দিয়া অসীমকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা, ইহা হইতেই কবির বিশ্বপ্রেমের উদ্ভব। বাহ্যপ্রকৃতির রূপসাগরে ডুব দিয়া দিয়া তিনি যেমন অরূপের সন্ধান পান, তেমনই মানবের কর্ম্মপ্রবাহে ঝাঁপ দিয়া, তাহাকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিয়া তিনি সেই অসীমেরই সমীপে উপস্থিত হইবেন এই আশা করেন। তিনি জানেন—

> বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো,
> সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।
> নয়ক বনে, নয় বিজনে, নয়ক আমার আপন মনে,
> সবার যেথায় তুমি, হে প্রিয়,
> সেথায় আপন আমারো।

কিন্তু এই প্রেম কি সহজে লাভ করা যায়? ইহাও সাধনা-লভ্য কবে যে ইহা সম্ভব হইবে তাহা কবি জানেন না।

আমার একলা ঘরের আড়াল ভেঙে বিশাল ভবে
প্রাণের রথে বাহির হ'তে পারব কবে ?
প্রবল প্রেমে সবার মাঝে ফিরব ধেয়ে সকল কাজে,
হাটের পথে তোমার সাথে মিলন হবে,
প্রাণের রথে বাহির হ'তে পারব কবে ?

কিন্তু তাঁহার আশা আছে—

যখন আমি পাব তোমায় নিখিল মাঝে
সেইখনে হৃদয়ে পাব হৃদয়রাজে।

নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডী ছাড়াইয়া বিশ্বের মধ্যে আপনাকে ব্যাপ্ত করিয়া দিতে না পারিলে, যাহারা 'সবার অধম, দীনের হতে দীন', যাহারা 'সবার নীচে, সবার পিছে' তাহাদের ভালবাসিতে না পারিলে ভগবৎপ্রেম নিরর্থক।

কবির স্বদেশপ্রেমও এই বিশ্বপ্রেমের উদারভাবে অনুপ্রাণিত। ভারত শুধু তাঁহার নিজের দেশ নহে, ইহা 'মহামানবের সাগরতীর'। আর এই ভারতের মধ্যে যাহারা পতিত জাতি বলিয়া অপমানিত ও নিপীড়িত তাহাদের জন্য করুণায় তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইয়াছে।

হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হতে হ'বে তাহাদের সবার সমান।

আমরা দেখিলাম, ভগবান আনন্দরূপে বিশ্বপ্রকৃতিতে এবং প্রেমরূপে বিশ্বমানবের মধ্যে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। এতক্ষণ আমরা তাঁহার শিবসুন্দর

মূর্ত্তিই দেখিয়াছি। কিন্তু তাঁহার যে অন্য মূর্ত্তিও আছে, তিনি যে দুঃখ ও অশুভরূপেও আপনাকে প্রকাশ করেন, তাহাও কবি আমাদিগকে ভুলিতে দেন নাই। কিন্তু ইহা সেই আনন্দময়েরই রুদ্ররূপ। দুঃখ ত সত্য নহে, একমাত্র সত্য হইতেছে আনন্দরূপম্। তবে আমরা চক্ষের সম্মুখে নিরন্তর এত দুঃখ এত কষ্ট দেখি কেন? নিজেরাও ত দুঃখকষ্টে জর্জ্জরিত হইতেছি? কিরূপে ইহার অস্তিত্ব অস্বীকার করি?

রবীন্দ্রনাথ বলেন, "আমাদের ছোট মনের ছোট ছোট বিষাদ অবসাদ নৈরাশ্য নিরানন্দ আমাদিগকে অন্ধ করিয়া দেয়, আনন্দরূপম্ অমৃতম্ আর দেখিতে পাই না; নিজের কালিমা দ্বারা আমরা একেবারে পরিবেষ্টিত হইয়া থাকি, চারিদিকে কেবল ভাঙাচোরা, কেবল অসম্পূর্ণতা, কেবল অভাব দেখি;—কাণা যেমন মধ্যাহ্নের আলোকে কালো দেখে, আমাদেরও সেই দশা ঘটে। একবার চোখ যদি খোলে, যদি দৃষ্টি পাই, হৃদয়ের মধ্যে নিমেষের মধ্যেও যদি সেই 'আনন্দ সপ্তকে সপ্তকে বাজিয়া উঠে,—যে আনন্দে জগদ্ব্যাপী আনন্দের সমস্ত সুর মিলিয়া যায়, তবে যেখানেই চোখ পড়ে, সেখানে তাঁহাকেই দেখি আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। বধে বন্ধনে, দুঃখে দারিদ্র্যে, অপকারে অপমানেও তাঁহাকেই দেখি—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। তখন মুহূর্ত্তেই বুঝিতে পারি প্রকাশমাত্রই তাঁহারই প্রকাশ—এবং প্রকাশমাত্রই আনন্দরূপমমৃতম্। তখন বুঝিতে পারি, যে আনন্দে আকাশে আকাশে আলোক উদ্ভাসিত, আমাতেও সেই পরিপূর্ণ আনন্দেরই প্রকাশ। সেই আনন্দে আমার ভয় নাই, ক্ষতি নাই, অসম্মান নাই।" (ধর্ম্ম, ১৯১-২ পৃষ্ঠা)।

'নৈবেদ্যে'র একটি গানে ঠিক এই ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে।—

তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যতদূরে আমি যাই,—
কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই।
মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ দুঃখ সে হয় দুঃখের কূপ
তোমা হ'তে যবে স্বতন্ত্র হয়ে আপনার পানে চাই।

'খেয়া'র কবি দুঃখকে ভগবানের মূর্ত্তিরূপে বরণ করিতেছেন,—

দুঃখের বেশে এসেছ বলে তোমারে নাহি ডরিব হে,
যেথায় ব্যথা সেথায় তোমা নিবিড় ক'রে ধরিব হে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'দুঃখ'-শীর্ষক প্রবন্ধেও দুঃখের সহিত ভগবানের এই একাত্মকতা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

হে পিতা তুমিই দুঃখ, তুমিই বিপদ, হে মাতা, তুমিই মৃত্যু তুমিই ভয়। তুমিই ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাম্। (ধর্ম্ম ১২৯ পৃষ্ঠা)

'গীতাঞ্জলিতে'ও এই একই সুর ধ্বনিত হইয়াছে। রুদ্রের তাণ্ডব নৃত্য ভীষণ হইলেও মঙ্গলকর, তাঁহার তীব্র তালের আঘাতে মানুষের বক্ষঃপঞ্জর চূর্ণ হইয়া গেলেও যে, তাহাতে সমস্ত সন্দেহ মন হইতে পলায়ন করে, সে কথা স্মরণ করিয়া তিনি 'সেই প্রচণ্ড মনোহরে' প্রেমের অঞ্জলি দিয়া হৃদয়ে গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন।

নাচো যখন ভীষণ সাজে তীব্র তালের আঘাত বাজে,
পালায় ত্রাসে পালায় লাজে সন্দেহ বিহ্বল।
সেই প্রচণ্ড মনোহরে প্রেম যেন মোর বরণ করে,
ক্ষুদ্র আশার স্বর্গ তাহার দিক সে রসাতল।

তারপরে যখন সত্যসত্যই রুদ্রের দীপ্তবজ্র ভক্তের বক্ষে পড়িয়া সেখানে দাবাগ্নি জ্বালাইয়া দেয়, তখনও সে অটল বিশ্বাসে তাঁহাকে বন্দনা করিতে থাকে—

এই করেছ ভালো নিঠুর, এই করেছ ভালো
এমনি করে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালো।
আমার এ ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে দেয় না কিছুই আলো।

যখন থাকে অচেতনে এ চিত্ত আমার—
আঘাত সে যে পরশ তব, সেই ত পুরস্কার।
অন্ধকারে মোহে লাজে চোখে তোমায় দেখি না যে,
বজ্রে তোল আগুন করে' আমার যত কালো।

আর মৃত্যু? সে ত 'আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা'—বরবধূর মিলন। তাহার জন্য আমার ভয় কি? দুঃখ কি? শ্মশানচারী মহাদেব যখন গৌরাকে বিবাহ করিতে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার জননী শিরে করাঘাত করিয়া ক্রন্দন করিলেও এবং পিতা দুঃখে ম্রিয়মাণ হইলেও গৌরী নিজে কি ভীতা হইয়াছিলেন?

শুনি শ্মশানবাসীর কলকল,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ!
সুখে গৌরীর আঁখি ছলছল
তাঁর কাঁপিছে নিচোলাবরণ!

তাঁর মাতা কাঁদে শিরে হানি কর
খ্যাপা বরেরে করিতে বরণ,
তাঁর পিতা মনে মানে পরমাদ,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

আমরাও কি ক্রন্দন-কোলাহলের মধ্যে এইরূপে হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারিব না? সারা জনম যাহার লাগিয়া সুখ-দুঃখের বোঝা বহিয়া বেড়াই, সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা কি-এক অজ্ঞাত আকর্ষণে যাহার দিকে নিরন্তর ধাবিত হয়, তাহার সহিত মিলনই ত জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা।—

বরণ-মালা গাঁথা আছে আমার চিত্তমাঝে,
কবে নীরব হাস্যমুখে আসবে বরের সাজে?
সেদিন আমার রবে না ঘর, কেইবা আপন কেইবা অপর
বিজন রাতে পতির সাথে মিলবে পতিব্রতা
মরণ, আমার মরণ, তুমি কও আমারে কথা।

এইখানেই রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব। যাহা কিছু আবির্ভাব তাহা সেই আনন্দরূপেরই আবির্ভাব। দুঃখে মৃত্যুতে সেই আনন্দময়েরই প্রকাশ। এই বাণী শুধু গীতাঞ্জলিতে নয়, অন্যত্রও নানারূপে তিনি প্রচার করিয়াছেন। রুদ্রের ভীষণ মুখ দেখিয়া তিনি সেই প্রাচীন ঋষির অভয়-মন্ত্র শুনাইতেছেন—রুদ্র, যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্,—হে রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাহার দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর। কিন্তু তাঁহার যে, 'সেই রক্ষা, তাহা ভয় হইতে রক্ষা নহে, মৃত্যু হইতে রক্ষা

নহে, বিপদ হইতে রক্ষা নহে, তাহা জড়তা হইতে রক্ষা, ব্যর্থতা হইতে রক্ষা, তাঁহার অপ্রকাশ হইতে রক্ষা'—

বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখ-তাপে ব্যথিত চিতে নাহি বা দিলে সান্ত্বনা
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।
আমারে তুমি করিবে ত্রাণ এ নহে মোর প্রার্থনা,
তরিতে পারি শকতি যেন রয়।
আমার ভার লাঘব করি নাহি বা দিলে সান্ত্বনা,
বহিতে পারি এমনি যেন হয়।

অতএব

'হে ভয়ঙ্কর, হে শঙ্কর হে পিতা হে বন্ধু, অন্তঃকরণের সমস্ত জাগ্রত শক্তির দ্বারা উদ্যত চেষ্টার দ্বারা, অপরাজিত চিত্তের দ্বারা তোমাকে ভয়ে দুঃখে মৃত্যুতে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিব, কিছুতেই কুণ্ঠিত অভিভূত হইব না, এই ক্ষমতা আমাদের মধ্যে উত্তরোত্তর বিকাশ লাভ করিতে থাকুক—এই আশীর্ব্বাদ কর।

এমনই করিয়া আনন্দের বার্ত্তা জগতে বড় বেশি লোক প্রচার করেন নাই। এমনই করিয়া দুঃখ, ভয়, মৃত্যু, অবসাদ তুচ্ছ করিয়া আত্মশক্তির উদ্বোধন করিতে শিক্ষা দিতে একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দ ব্যতীত বর্ত্তমান যুগে অধঃপতিত ভারতবর্ষে আর কেহ আবির্ভূত হ'ন নাই।

বিবেকানন্দের সহিত আধ্যাত্মিক জগতে রবীন্দ্রনাথের যে শুধু এইখানেই মিল তাহা নহে। মানবের হিতসাধন দ্বারা ভগবল্লাভের যে পথ, বিবেকানন্দ তাহাই প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া বারংবার নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

আমরা দেখিয়াছি রবীন্দ্রনাথও এই প্রেমের পথ দিয়াই, এই কর্ম্মযোগে বিশ্ব-মানবের সহিত এক হইয়াই আনন্দময়ের দর্শনলাভ সম্ভব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইহার তুলনায় জপতপ ধ্যানধারণা দ্বারা মুক্তিলাভ-চেষ্টাও বাঞ্ছনীয় নহে।

মুক্তি ? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি ? মুক্তি কোথায় আছে ?
আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন পরে' বাঁধা সবার কাছে।
রাখ্ রে ধ্যান, থাক্ রে ফুলের ডালি,
ছিড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধুলাবালি,
কর্ম্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে ঘর্ম্ম পড়ুক ঝরে।
তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করুচে চাষা চাষ,
পাথর ভেঙে কাট্‌চে যেথায় পথ, খাট্‌চে বারোমাস।
রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে,
ধূলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে ;
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি আয়রে ধূলার 'পরে।

এই জন্যই ত অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন—

'বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।'

এবং ইহাই যে তিনি 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' সন্ন্যাসীর জীবনে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

তাঁহার আকাঙ্ক্ষা 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ'। একদিকে তিনি যেমন রূপরসগন্ধময়ী প্রকৃতির সৌন্দর্য্য হইতে চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া যোগাসনে বসিতে চাহেন না, কারণ, এই সৌন্দর্য্যের, এই আনন্দের মধ্যেই ভগবান

আছেন। অপর দিকে তেমনই আবার তিনি মানবের কর্ম্মকোলাহল হইতেও নিজেকে সরাইয়া লইতে ইচ্ছা করেন না, কারণ, সেখানেও সেই তিনিই রহিয়াছেন।

কিন্তু তাই বলিয়া যেন কেহ মনে না করেন, যে কবি বিষয়ভোগাসক্তি বা সাংসারিক মোহান্ধতাকে আধ্যাত্মিক উন্নতির অন্তরায় বলিয়া স্বীকার করেন না। তিনি তাঁহার গদ্য প্রবন্ধে বলিতেছেন—

এই রেশম-পশম, আসনবসন, স্বর্ণরৌপ্য আমার কে? তাহারা আমাকে কি দিতে পারে? তাহারা আমার পরম সম্পৎকে অন্তরাল করিতেছে, কেবল তাহাদের পুঞ্জীভূত সঞ্চয়ে গর্ব্ববোধ করিতেছে। * * সর্ব্বাপেক্ষা হীনতম দীনতা যে পরমার্থ-হীনতা তাহার দ্বারা সমস্ত অন্তঃকরণ রিক্ত, শ্রীহীন, মলিন। কাজ করিতে পারি না, কারণ শয্যা আসন বেশভূষার কাছে দাসখৎ লিখিয়া দিয়াছি, জড় উপকরণ জঞ্জালের কাছে মাথা বিকাইয়া দিয়াছি—সেই সকল ধূলিময় পদার্থের ধুলা ঝাড়িতেই আমার দিন যায়। * * * সকল মঙ্গলকর্ম্ম পড়িয়া রহিল, কারণ পাঁচ জনের মুখে নিজের নামকে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়া আড়ম্বরে জীবন যাপন করিতেই আমার সমস্ত চেষ্টার অবসান। যিনি সকল সত্যের সত্য, অন্তরে বাহিরে, জ্ঞানে ধর্ম্মে কোথাও তাঁহাকে দেখি না। (ধর্ম্ম, ৫২ পৃষ্ঠা)

এই 'জাল জঞ্জালগুলিতে' যদি মানুষের হৃদয় মন জড়াইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার উপরে উঠিবার সমস্ত শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। তখন হয়ত তাহার লক্ষ ভ্রষ্ট জীবনের ব্যর্থতা মাঝে মাঝে তাহাকে পীড়া দিতে থাকে। গীতাঞ্জলির একটি গানে কবি বলিতেছেন—

ধনে জনে আছি জড়ায়ে হায়।
তবু জানো মন তোমারে চায়।

এই আক্ষেপ অন্যান্য গানেও ফুটিয়া বাহির হইয়াছে—

বিষয়-বোঝা টানে আমায় নীচে।

আবার—

কত মায়া বাঁশীর সুরে ডাকচে আমায় মিছে।

কিন্তু মানুষের এমনই দুর্ব্বলতা, যে, সে এসব মোহবন্ধন কিছুতেই ছিন্ন করিতে পারে না।

জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই
ছাড়ায়ে গেলে ব্যথা বাজে।
মুক্তি চাহিবারে তোমার কাছে যাই
চাহিতে গেলে মরি লাজে।
জানি হে তুমি মম জীবনে শ্রেয়তম,
এমন ধন আর নাহি যে তোমা সম,
তবু যে ভাঙা চোরা ঘরেতে আছে পোরা
ফেলিয়া দিতে পারি না যে।

তখন তাঁহারই শরণ লওয়া ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই।

তোমার দয়া যদি চাহিতে না-ও জানি,
তবুও দয়া করে' চরণে নিয়ো টানি।
আমি যা গড়ে' তুলে আরামে থাকি ভুলে
সুখের উপাসনা করি গো ফলে ফুলে,
সে ধুলা-খেলাঘরে রেখো না ঘৃণাভরে
জাগায়ো দয়া ক'রে বহ্নি-শেল হানি।

শেষে যখন সত্যসত্যই তিনি বহ্নিশেল হানিয়া মানবের তুচ্ছ পার্থিব

সুখসম্পদ ভস্মীভূত করিয়া দেন, তখন যে প্রকৃত ভক্ত, সে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে গাহিতে থাকে—

আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই, বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে ?
এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর জীবন ভরে'।

এই বিষয়সুখ-লালসার সহিত অহঙ্কার জড়িত হইয়া আছে। ইহাকেও দূর করিতে হইবে। অহঙ্কারের মলিন বস্ত্র ছাড়িয়া প্রেমের বসন পরিয়া তাঁহার পূজা করিতে না পারিলে তাঁহাকে কি পাওয়া যায় ?

ছাড়িতে পারিনি অহঙ্কারে,
ঘুরে মরি শিরে বহিয়া তারে ;
ছাড়িতে পারিলে বাঁচি যে হায়।
তুমি জান মন তোমারে চায়।

তখনও তাঁহারই চরণে প্রার্থনা করিতে হয়—

আমার মাথা নত ক'রে দাও হে তোমার চরণ-ধূলার তলে,
সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।

কিন্তু যখন হৃদয়ে ভগবদ্দর্শনজনিত ভূমানন্দের সঞ্চার হয়, যখন সেই 'আনন্দেরই সাগর থেকে' বান আসিয়া মানুষকে অনন্তের দিকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, তখন এক নিমেষে বিষয়াসক্তি ছুটিয়া যায়,—তখন আর কাহারও কথা না শুনিয়া মন সেই আনন্দময়ের চরণে আত্মসমর্পণ করে—

কে ডাকে রে পিছন হতে, কে করে রে মানা ?
ভয়ের কথা কে বলে আজ, ভয় আছে সব জানা।

এখন হইতে সাধনপথের সমস্ত বাধা দূর হইল। সম্মুখে আনন্দ-

সাগর; আর তাহাতেও কোন্ কাণ্ডারী তরণী বাহিয়া চলিয়াছেন? তাঁর অমল ধবল পা'লে মন্দ মধুর হাওয়া লাগিয়াছে। আহা! এ তরী

কোন সাগরের পার হ'তে আনে কোন্ সুদূরের ধন।
ভেসে যেতে চায় মন,
ফেলে যেতে চায় এই কিনারায় সব চাওয়া, সব পাওয়া ॥

এইখানে আমার গীতাঞ্জলিব্যাখ্যা শেষ করি। আমি তত্ত্বের সন্ধানে এই গীতিকুঞ্জে প্রবেশ করি নাই, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি গান বা কবিতা হৃদয়ের বস্তু, হৃদয় দ্বারাই তাহা গ্রহণ করিতে হইবে আমি আমার প্রাণের অনুভূতি দিয়া এই গানগুলির মধ্যে যতটুকু প্রবেশ করিতে পারিয়াছি, তাহাই এখানে প্রকাশ করিলাম, যুক্তিতর্কের সাহায্যে কোন তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পাই নাই।

আমি যে ভাবধারার বিবৃতি করিলাম তাহা কাব্যরসের দিক হইতে, ব্যক্তিগত অনুভূতির দিক হইতে। সুতরাং যদি অন্য কেহ গানগুলির মধ্যে অন্যরূপ ভাবের লীলা লক্ষ্য করিয়া থাকেন তাহা হইলেও পরস্পরকে ভ্রান্ত মনে করিবার কারণ নাই। কারণ শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য মাত্রেরই এই গুণ আছে যে, তাহা বিভিন্ন পাঠকের নিকট বিভিন্ন ভাবের উৎসরূপে প্রতিভাত হয়। তা' ছাড়া, আমি গীতাঞ্জলির অংশমাত্র লইয়া আলোচনা করিলাম। সমগ্র কাব্যখানির উপর আরও অনেক কথা বলিবার আছে।

কবি ও ঋষি

স্মরণাতীত কাল হইতে পৃথিবীর সভ্য দেশসমূহে এমন অনেক দিব্যশক্তি-সম্পন্ন পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, যাঁহাদের স্বচ্ছ মানস-দর্পণে বিশ্বের গূঢ়তত্ত্ব-সকল প্রতিফলিত হইয়া ধরা দিয়াছে, এবং যাঁহারা সেই-সকল আত্মোপলব্ধ সত্য জনসমাজে প্রচার করিয়া মানব-সভ্যতার বিকাশ-ধারা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন।

ইঁহাদের সকলকেই মন্ত্রদ্রষ্টা বা সত্যদ্রষ্টা ঋষি আখ্যায় অভিহিত করা যাইতে পারে। শুধু বেদমন্ত্র কেন, অতীন্দ্রিয় সত্যের সাক্ষাৎকার বা উপলব্ধিমাত্রেই অপৌরুষেয়। কারণ তাহা মানবের মধ্য দিয়া পরমব্রহ্মের পূর্ণ জ্যোতির আংশিক প্রকাশ এবং এই-সকল ভগবদনুগৃহীত মহাপুরুষই ঋষি, তা সে তাঁহারা যে-দেশের ও যে-যুগেরই হউন না কেন।

যদিও প্রাচীনকালে প্রধানতঃ বেদমন্ত্রের রচয়িতাদেরই আমাদের দেশে ঋষি বলা হইত, তথাপি কপিল-কণাদাদি ষড়্‌দর্শনকার

এবং ব্যাস, বাল্মীকি প্রভৃতি মহা-কবিগণও ঋষি নাম পাইয়াছেন। ইঁহারা কেহই মন্ত্রদ্রষ্টা ছিলেন না। সুতরাং অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগেরও শ্রেষ্ঠ মনীষী বা কবির বিশিষ্ট গুণ বুঝাইবার জন্য ঋষি শব্দের ব্যবহার অসঙ্গত বলিয়া আমরা মনে করি না। গত্যর্থ (=বুদ্ধ্যর্থ)-বাচক ঋষি শব্দের ব্যুৎপত্তি-গত অর্থ ধরিলেও এরূপ প্রয়োগে কোন দোষ আসে না।

অলৌকিক জ্ঞান বুদ্ধি বা মনীষার আলোকে যাঁহার চিত্তাকাশ উজ্জ্বল এবং এক স্বর্গীয় প্রেরণায় যিনি নিজ হৃদয়ে পরম সত্যের অনুভূতি লাভ করেন তিনিই ঋষি।

সুতরাং ঋষি যে শুধু প্রাচীন যুগেই আবির্ভূত হইতেন এবং এখন আর দৃষ্টিগোচর হ'ন না, এরূপ কথা বলা চলে না। যখনই কোন কবি, দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক চিরন্তন ধ্রুব সত্যের একটা অভিনব দ্বার খুলিয়া দেন, তখনই আমরা ঋষির সাক্ষাৎকার লাভ করি।

আমি কবির কথাই বিশেষ করিয়া বলিব। সত্য-শিব-সুন্দরের উপাসক কবি আপনার কাব্য-সৃষ্টির অন্তরালে যে-সকল গভীর তত্ত্বের আভাস দেন, তাহা ঋষির সত্য-দর্শন হইতে ন্যূন নহে। বৈদিক ঋষিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত যাঁহারা ন্যায়, ধর্ম্ম, সত্যমূলক ভগবানের পরমবাণী প্রচার করিয়াছেন তাঁহারা একাধারে কবি ও ঋষি।

ঈসা, মূসার ন্যায় যাঁহারা ঐশী শক্তির প্রভাবে দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়া সত্যধর্ম্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা Prophets বা ঋষি নামে বিদিত হইলেও তদানীন্তন যুগের কবি ছিলেন।

তাই কবি শেলী বলিয়াছেন—Poets were called, in the earlier epochs of the world, legislators or prophets।

শেলীর এই উক্তির মর্ম্ম এইযে, এই-সকল মহাপুরুষগণ প্রকৃতপক্ষে কবিই ছিলেন, লোক তাঁহাদিগকে কবি না বলিয়া শাস্তা, শাস্ত্রকার, ভাববাদী বা ঋষি আখ্যা দিয়াছে।

লর্ড বেকনও তাঁহার একটি প্রবন্ধে ('Of Religion') প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদিগের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, কাব্যই ছিল তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র এবং কবিগণই ছিলেন তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রকার।

বৈদিক ঋষিগণের কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া ম্যাক্‌ডোনেল সাহেব স্বরচিত 'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে' কয়েকটি ঋকের অনুবাদ করিয়া তাহাদের কাব্যসৌন্দর্য্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই-সকল আত্মজ্ঞানী ঋষি যে ভগবৎপ্রভাবান্বিত কবি ছিলেন, তাহা আমাদের স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবার কারণ নাই।

ঋষির ন্যায় কবিরও সেই 'vision and the faculty divine'—সেই পরমজ্ঞান ও দিব্যদৃষ্টি থাকে, যাহাতে উভয়কে একই শ্রেণীতে ফেলিতে পারা যায়। একথা যদি সত্য হয় যে, 'Poetry is the record of the best and happiest moments of the happiest and best minds' —কবিতা আনন্দোদ্ভাসিত-চিত্ত মনীষার অসীমানন্দপূর্ণ শুভ মুহূর্ত্তগুলির পরিচয় দেয়, তাহা হইলে আর কবিত্বে ও ঋষিত্বে প্রভেদ কি? একদিকে যেমন "ঋষির নয়ন মিথ্যা হেরে না, ঋষির রসনা মিছে না

কহে," তেমনই অপরদিকে আবার কবির শ্রেষ্ঠ-মুহূর্ত্ত-সঞ্জাত আনন্দ-ধারাপ্লুত আত্মোপলব্ধিও কখনও মিথ্যা হইতে পারে না।

কবি যে আপনার প্রাণের অন্তরতম প্রদেশে নিরন্তর এক অজ্ঞাত শক্তির প্রেরণা, এক অনির্ব্বচনীয় উন্মাদনা, এক স্বর্গীয় আবেশ অনুভব করেন, তাহার উল্লেখও এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইহা সেই রহস্যময়ী শক্তি যাহার মধ্যে কবি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিয়া বিহ্বল প্রাণে বলিতে থাকেন—

একি কৌতুক নিত্য নূতন
ওগো কৌতুকময়ী,
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই?
অন্তরমাঝে বসি অহরহ
মুখ হ'তে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।
কি বলিতে চাই সব ভুলে যাই,
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,
সঙ্গীতস্রোতে কূল নাহি পাই
কোথা ভেসে যাই দূরে।

কবির এই অন্তরবাসিনী প্রেরণাই তাঁহার জীবন-দেবতা। কবি নিজে এই দেবতার হস্তের বীণাটি মাত্র, তিনিই কবিকে দিয়া আপনার গান গাওয়াইতেছেন, আপনার বাণী প্রচার করিতেছেন। একথা যে শুধু রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, এবং ইহা যে শুধু তাঁহারই নিজস্ব আত্মানুভূতি, তাহা নয়। শ্রেষ্ঠ কবিমাত্রেই এই অসীম রহস্যময়ী শক্তির সম্পূর্ণ অধীন।

শেলী তাই কবির হৃদয়ে প্রকৃত কবিত্বের বিকাশ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—It is, as it were, the interpretation of a diviner nature through our own—ইহা যেন আমাদের মধ্য দিয়া কোন স্বর্গীয় প্রকৃতির আত্ম প্রকাশ।

মহাকবি গেটেও এই ঐশী শক্তির বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন। তিনিও ইহাকে Genius of Life বা জীবন-দেবতা বলিয়াছেন, 'which does with him what it pleases and to which he unconsciously resigns himself. whilst he believes he is acting from his own impluse'—

এই জীবন-দেবতা কবিকে যদৃচ্ছাক্রমে চালিত করেন,এবং কবি যখন মনে করেন, তিনি নিজের ভাবাবেশে লিখিতেছেন, তখন তিনি প্রকৃত পক্ষে অজ্ঞাতসারে এই শক্তির নিকট আত্মোৎসর্গ করেন।"

গেটের এই উক্তি কি রবীন্দ্রনাথেরই "তুমি যা বলাও আমি বলি তাই" কথারই রূপান্তর মাত্র নহে? এই দিব্য শক্তি যাঁহার জীবন-দেবতা Genius of Life, এবং যিনি এই শক্তির প্রভাবে diviner nature বা স্বর্গীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হন, তিনি ঋষি হইতে কম কিসে?

তবে যে সকলে কবিকথাকে ঋষিবাক্যের ন্যায় শিরোধার্য্য করিয়া লয় না, তাহার কারণ, লোকের রুচি, সংস্কার ও প্রকৃতির বিভিন্নতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ঋষিমাত্রেরই মত বা উক্তি কি আমরা সকলেই গ্রহণ করি? চার্ব্বাক ঋষির নাস্তিকতা কিংবা কপিল ঋষির সাংখ্য মত যেমন সর্ব্বজনগ্রাহ্য হয় নাই, সেইরূপ সকল কবির প্রচারিত মত বা তত্ত্ব সকলে মানিয়া লইতে না পারেন।

আধুনিক ঋষিদের মধ্যে টলষ্টয়ের স্থান অতি উচ্চে। কিন্তু ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রসংক্রান্ত তাঁহার মত অনেকেরই—বিশেষতঃ গোঁড়া খৃষ্টানদের—মনঃপূত হয় নাই।

কবি ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের কাব্য-সাধনার মূল মন্ত্র ছিল,—সমগ্র বিশ্বে এক ঐশ্বরিক সত্তার ব্যাপ্তি বা প্রকাশের উপলব্ধি, অথবা আমাদের ভাষায় "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।" ইহা ইংরেজ পাঠক কবির একটা মত বা ধারণামাত্র বলিয়া মনে করেন। কারণ, তাঁহাদের ধর্ম্মে ঠিক ইহার অনুরূপ কিছু নাই। আমরা কিন্তু মনে করি যে, ইংরেজ কবির হৃদয়ে এই মহাসত্যটীর উন্মেষই তাঁহাকে ঋষিত্বে উন্নীত করিয়াছে। কারণ, তিনি কবিত্ব-প্রভাবে হিন্দু ঋষির তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

তিনি যখন এই সর্ব্বব্যাপী সত্তাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন—A motion and a spirit that impels all thinking things, তখন আমাদের উপনিষদের "যেনাহুর্মনোমতম্" মনে পড়িয়া যায় এবং ইংরেজ কবি হিন্দুর এই তত্ত্বের কত নিকটে পৌঁছিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারি। এইখানেই তাঁহার ঋষিত্ব। সুতরাং কোন বড় কবির মত বা তত্ত্ব আমরা গ্রহণ করিতে পারি না বলিয়া যে তিনি ঋষি হইতে পারেন না, এরূপ যুক্তি দাঁড়াইতে পারে না।

আর ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, ঋষি বলিতে ঠিক saint বা সাধু বুঝায় না। সুতরাং কোন কোন কবি সামাজিক হিসাবে আদর্শ জীবন যাপন করিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহাদের ঋষিত্বের হানি হয় নাই। আমাদের প্রাচীন ঋষিদের মধ্যেও শকুন্তলার জনক বিশ্বামিত্র এবং কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের জনয়িতা পরাশর অকলুষিত-চরিত্র ছিলেন না। শুধু

চন্দ্রে নয়, সূর্য্যেও কলঙ্ক আছে। কিন্তু চন্দ্রের পক্ষে যাহা কালিমা হইয়াছে, সূর্য্যের স্বীয় দীপ্ত তেজ তাহা ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে কবিমাত্রেই ঋষিত্বের দাবী করিতে পারেন না। নূতন বাণী শুনাইতে বা নূতন তত্ত্ব প্রচার করিতে বড় বেশী কবি জন্মগ্রহণ করেন না। কল্পনার হাওয়ায় ভাষার রঙ্গীন ফানুস উড়াইতে পারিলেই বড় কবি হওয়া যায় না। এই শ্রেণীর কবিদের প্রতিভা যদি প্রদীপ্ত অনলের ন্যায় উজ্জ্বল না হয়, এবং তাহার সহিত যদি গভীর অন্তর্দৃষ্টি, প্রগাঢ় আত্মানুভূতি, এবং সর্ব্বোপরি এক দিব্য শক্তির ভাবাবেশ সম্মিলিত না হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিব না, এবং তাঁহাদের কবিত্বে ঋষিত্বের ধর্ম্ম বা গুণ থাকিতে পারে না।

ইংরেজীতে এইরূপ শ্রেষ্ঠ কবিকে transcendental poet বা অতীন্দ্রিয়দর্শী কবি বলে। আমাদের আধুনিক সাহিত্যের কাব্যকুঞ্জ অনেক কবির মধুর ঝঙ্কারে মুখরিত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কাহাকেও ঋষিকবি বলা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ শুধু শ্রেষ্ঠ কবি নহেন, তিনি অদ্বিতীয় মনীষী। তিনি নোবেল প্রাইজ্ পাইয়াছেন বলিয়াই যে বড় কবি হইয়াছেন তাহা নহে। দেশ তাহার অনেক পূর্ব্বেই তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল। পাশ্চাত্য দেশে তাঁহার কিরূপ আদর হইয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কেহ কেহ তাঁহাকে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, মিল্‌টন্, ডাণ্টে অপেক্ষা বড় কবি বলিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল

(১)

দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যনাটকাদির দোষগুণ বিচার করিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা করি নাই। তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টির অন্তরালে যে উদ্দেশ্যের প্রেরণা আমরা পরিস্ফুটরূপে দেখিতে পাই, তাহাই আজ আমাদের আলোচ্য। তিনি প্রধানতঃ লোকশিক্ষার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, দেশহিতে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহারই শিক্ষা দেশবাসীকে দিয়া গিয়াছেন। তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছিলেন—

বিশ্ব মাঝে নিঃস্ব মোরা অধম ধূলি চেয়ে ;

তাই তিনি শুধু কোমল ভাবের বন্যায় দেশকে প্লাবিত না করিয়া বিদ্রূপের কশা ও পৌরুষের আগুন লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। একদিকে যেমন ভণ্ড ও অসাধুর পৃষ্ঠদেশে তাঁহার এই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কশা বর্ষিত হইয়াছে, অপরদিকে তেমনই আবার তাঁহার পৌরুষপূর্ণ স্বদেশ-প্রেমের বহ্নিতে জনসাধারণের মনকে বিশুদ্ধ ও ভক্তিপূত করিতে তিনি চেষ্টিত হইয়াছেন। অধঃপতিত জাতির চরিত্রগত দোষসমূহের সংশোধন,

দেশেরই ইতিহাস হইতে বীরত্ব, মনুষ্যত্ব ও দেশভক্তির অপূর্ব্ব আদর্শ প্রদর্শন, এবং পরিশেষে আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালীকে তাহার গৌরবমণ্ডিত অতীতের কথা স্মরণ করাইয়া তাহার ম্রিয়মাণ প্রাণে আশা ও উৎসাহের উদ্বোধন,—এই উদ্দেশ্যের প্রেরণাই দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যসৃষ্টির ধারা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিল।

দেশের যাহা কিছু সমস্তই তিনি ভালবাসিতে পারেন নাই। আমাদের আচারে, ব্যবহারে, সমাজে, ধর্ম্মে, যে সকল দোষ, ক্রটি, কদাচার, কুপ্রথা দেশের অশেষবিধ অনিষ্ট সাধন করিতেছে, সেগুলিকে তিনি সনাতন বলিয়া মানিয়া না লইয়া নির্ম্মমভাবে উৎপাটিত করিয়া ফেলাই কর্ত্তব্য মনে করিয়াছিলেন। ব্যাধিদুষ্ট মৃতবৎ সমাজশরীরে তীব্র তিক্ত মুষ্টিযোগ প্রয়োগে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। এই কারণে যাঁহারা তাঁহার স্বদেশপ্রেমে আন্তরিকতার অভাব দেখেন তাঁহারা এই দেশভক্তের প্রতি ঘোর অবিচার করেন। সুদীর্ঘ কালের পরাধীনতায় রুদ্ধগতি জাতীয় জীবনে কি পঙ্কিল আবিলতা আসে নাই? এবং তাহার ফলে কি আমাদের নৈতিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অশেষ অবনতি হয় নাই? যদি তাহা হইয়া থাকে ধর্ম্ম ও সমাজ নানা কুসংস্কার ও কুপ্রথায় জর্জ্জরিত এ কথা যদি সত্য হয়, ভণ্ডামি ও শঠতায় দেশ যদি ছাইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে যিনি এই মনুষ্যত্বহীন জাতিকে ‘আবার তোরা মানুষ হ’ বলিয়া উঠাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার দেশভক্তিতে কৃত্রিমতা থাকিতে পারে না।

ছিলাম বা কি, হয়েছি এ কি!
সে কথা নাহি ভাবিয়া দেখি;
নিজের দোষ দেখালে কেহ মারিতে যাই খেয়ে!

সুতরাং দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রেমে যে আমরা আন্তরিকতার অভাব দেখিব তাহা বিচিত্র নহে।

এইরূপে তিনি দেশের প্রকৃত আত্মাটিকে জাগাইয়া তুলিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। আবার, যখন প্রয়োজন হইয়াছিল তখন উদ্দীপনার মদিরা দেশবাসীকে আকণ্ঠ পান করাইয়াছিলেন। তিনি বন্ধুদের নিকট বলিতেন। "আমাদের দেশ এখন কুম্ভকর্ণের ন্যায় ঘুমাইতেছে। রামায়ণের কুম্ভকর্ণকে জাগাইবার সময় প্রথমে তাহার নাসিকার মধ্যে নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্য প্রবিষ্ট করাইয়া তারপর অন্যরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল; আমিও প্রথমে সকলকে শুধু হাসাইবার জন্য অনেক গান ও 'বিরহ' 'ত্র্যহস্পর্শে'র ন্যায় প্রহসন লিখিয়াছি, সেই সঙ্গে দেশকে আঘাতও করিয়াছি এবং পরে অন্যরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছি।"

দেশের মঙ্গল-কামনাই যে তাঁহার সাহিত্য-সাধনার মূলমন্ত্র ছিল, তাহা আমরা তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের সূচনা হইতেই দেখাইতে চেষ্টা করিব। এই দেশানুরাগ যে তিনি তাঁহার নিজস্ব যুগ হইতে কিয়ৎ-পরিমাণে পাইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

'দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দী'র জাতীয় জড়তা ও অবসাদের পর দেশ তখন ইংরাজী শিক্ষার ফলে আত্মচৈতন্যে প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল, এবং বঙ্কিম প্রমুখ নবযুগের সাহিত্যিকগণ অপূর্ব্ব প্রভাতী গাহিয়া প্রথম জাগরণের শুভ মুহূর্ত্ত আনয়ন করিতেছিলেন। শেষ রজনীর ঘোরান্ধকার কাটিয়া গিয়াছিল। জননী তাঁহার 'বিপুল নীড়ে ধীরে ধীরে জাগিতেছিলেন। সমাজে, ধর্ম্মে, সাহিত্যে, রাষ্ট্রে সর্ব্বত্রই প্রবল চাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল।

জাতীয় জীবনের এই স্মরণীয় সন্ধিক্ষণে দ্বিজেন্দ্রলালের আবির্ভাব। হেম-নবীনের কাজ তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে; সাহিত্য-সূর্য্য বঙ্কিমচন্দ্র অস্তপারের চিন্তায় 'ধর্ম্মতত্ত্বে' অভিনিবিষ্ট; এবং নব রবির কিরণালোকে বঙ্গ-গগনের প্রাচীদেশ উদ্ভাসিত। এই সময়ে বালক দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার অস্ফুট হৃদয়-কুসুমে গ্রথিত সঙ্গীতমালিকা 'আর্য্যগাথা' 'জননী বঙ্গভাষা'র 'অমল-চরণ-কমলে' নিবেদন করিলেন। ঊনবিংশ-বর্ষ-বয়স্ক তরুণ যুবক দ্বিজেন্দ্রলালের প্রাণ তখন হইতেই দেশের দুর্দ্দশা-স্মরণে কাঁদিত। তাঁহার এই প্রথম কাব্যের ভূমিকায় তিনি লিখিতেছেন, 'যদি কাহারও অধঃপতিতা হতভাগিনী দুঃখিনী মাতৃভূমির নিমিত্ত নেত্রপ্রান্ত কখন সিক্ত হইয়া থাকে, আর্য্যগাথা তাহারই আদর চাহে।"

বিলাতে অবস্থানকালে দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বিতীয় গ্রন্থ ইংরেজী Lyrics of Ind প্রকাশিত হয়; সুদূর প্রবাসেও মাতৃভূমির জন্য যে তাঁহার হৃদয় দুঃখ ও বেদনায় আকুল হইত, তাহা এই পুস্তকের প্রথম কবিতা The Land of the Sun হইতে আমরা দেখিতে পাই। কবি ভারত মাতার একটি অতি গৌরবোজ্জ্বল বর্ণনা দিয়া শেষে বলিতেছেন—

O my land, can I cease to adore thee,
Though to gloom and to misery hurled ?
O dear Bharat ! my beautiful maiden,
O sweet Ind ! Once the Queen of the world !

যদিও আঁধার দুঃখের মাঝে নিপতিতা আজি তুমি,
তথাপি কি অবহেলিতে তোমারে পারি গো জনমভূমি ?

তুমি যে একদা, হে মোর ভারত, আছিলে জগত-রাণী,
ওগো সুন্দরী ভারত, আমার প্রিয় নিকেতনখানি !

And though wrecked is thy pride and thy glory,
Of it nothing remaims but the name ;
Yet a beauty and sunshine still lingers,
And yet gleams through the midst of thy shame.

যদিও সে তব গৌরব যশ সকলি পেয়েছে লয়,
কিছু নাই আর এখন তাহার নামটুকু শুধু রয়,
তবুও সে তব লাজ কুহেলিকা ভেদিয়া দেখি যে আসে,
কি এক সুষমা—রবির কিরণ, এখনও নয়নে ভাসে !

বিংশ বৎসর পরে যে প্রদীপ্ত স্বদেশপ্রেম 'আমার দেশ' গানে এ দেশে উদ্দীপনার বহ্নি জ্বালিয়া দিয়াছিল, এই ইংরেজী কবিতাতে কি তাহারই স্ফুলিঙ্গ লক্ষিত হইতেছে না ?

বিলাত হইতে ফিরিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে অস্বীকার করায় দ্বিজেন্দ্রলাল যখন একঘরে হইলেন, তখন তিনি ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া ভীষণভাবে হিন্দু সমাজকে আক্রমণ করিয়া 'একঘরে' নামক পুস্তিকা লিখিলেন। এই পুস্তক উপলক্ষ করিয়া তাঁহার দেশপ্রীতিসম্বন্ধে অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়াছে বলিয়া আমরা ইহার সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত আলোচনা করিব। ইহার ভাষা যে অত্যন্ত তীব্র, তাহা লেখক নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। নিদর্শন-স্বরূপ আমরা শেষ কয় ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"হিন্দু-সমাজ পচিতেছে—পৃথিবীর লজ্জা, মনুষ্যজাতির আবর্জনা, পরাজিত, প্রতাড়িত, পদাহত হিন্দুজাতি আজ পচিতেছে।

শঠতার ভাণ্ডার, মিথ্যা কথার ওস্তাদ, লুকোচুরির সর্দার, ভীরুতার সেনাপতি, হিন্দুজাতি আজ পচিতেছে।"

এই তীব্রতার সহিত কোন কোন স্থলে ব্যঙ্গ মিশ্রিত হইয়াছে। একস্থলে আছে—

'পেয়াদা শ্বশুরালয়ে যাইব বলিলে যেমন তাহাকে মারিতে ইচ্ছা করে, কেহ তাঁহার ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণা স্ত্রীকে প্রেয়সী বলিয়া ডাকিলে অপরের যে যাতনা হয়, হিন্দুকে আজ জাতি বলিলে আমার তেমনি শরীরে বেদনা হয়।'

কিন্তু তিনি হিন্দুজাতি ও সমাজের উপর যে এত গালিবর্ষণ করিয়াছিলেন—

"তাহা বিদ্বেষে নহে, শত্রুভাবে নহে; ভ্রাতার প্রতি ভ্রাতার যে ক্রোধ, অন্যায়-ব্যবহারী পিতার প্রতি পুত্রের যে ক্রোধ সেই ক্রোধে।"

তিনি এই তীব্র ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন। হিন্দুসমাজ ভণ্ডামি ও শঠতায় পূর্ণ বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল। সকল প্রকার দুষ্কর্ম এ সমাজে অনুষ্ঠিত হইতেছে; কিন্তু পাপী দুরাচারদিগকে সমাজ শাসন করে না। আর কে কাহাকে শাস্তি দিবে? সমাজের প্রায় সকলেই যে এই রকম। ইহারা বিলাতফেরতাদিগকে একঘরে করিবে; কিন্তু নিজেরা "রুদ্ধ কবাটে মুরগীর ঝোল খাইয়া বাহিরে আসিয়া অমায়িক মিছা কথা কহিয়া পুণ্যসঞ্চয়" করিবে। আত্মাভিমানক্ষুণ্ণ দ্বিজেন্দ্রলাল হয়ত ন্যায়ের মর্য্যাদা ঠিক রাখিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি যে স্বজাতিদ্রোহী ছিলেন না, পরন্তু দেশের মঙ্গলকামনাই তাঁহার এই আক্রমণের মূলে নিহিত ছিল তাহার প্রমাণও এই পুস্তকেই রহিয়াছে। তিনি বলিতেছেন—

"একঘরে করিতে চাহেন, আসুন আজ যে-সব বিষয় সমাজের অমঙ্গলের হেতু তাহাদিগকে একঘরে করি। আসুন আজ বলি, যে শঠতা করিবে, মিছা কথা কহিবে

তাহাকে একঘরে করিব; যে পঞ্চ-বর্ষীয়া বালিকার বিবাহ দিবে তাহাকে একঘরে করিব; যে যুবতী বিধবার স্বেচ্ছিত বিবাহে বাধা দিবে তাহাকে একঘরে করিব; আসুন, যে সব ব্যাধি জাতির বুকে বসিয়া অবাধে বুকের রক্ত পান করিতেছে, যাঁহারা নির্ভয়ে উন্নতির, প্রেমের, সত্যের হৃদয়ে শেল বিঁধিতেছে তাহাদিগকে একঘরে করি। সে 'একঘরে'তে দেখিবেন দেশের মঙ্গল হইবে, জাতির জীবন ফিরিবে। সে একঘরের অর্থ অধর্ম্মের প্রতি সমাজের কেন্দ্রীভূত ঘৃণা ও ক্রোধ; সে একঘরের অর্থ অনর্থের উচ্ছেদ; জ্ঞানের, সত্যের, উল্লাসের নবরাজ্য। নইলে যেখানে কেশবচন্দ্র সেন, মনোমোহন ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী একঘরে সেখানে একঘরেতে কেহ ভীত হইবে না। সে একঘরের অর্থ বিদ্যা, প্রতিভা, সত্য, ন্যায়, ধর্ম্ম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই 'একঘরে' পুস্তিকায় আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যঙ্গশক্তির প্রথম পরিচয় পাই। ইহাই এখন তিনি সমাজব্যাধির প্রতিকারের চেষ্টায় নিয়োজিত করিলেন। তাঁহার ভাষা আর কখনও তীব্র হয় নাই। এখন হইতে তিনি সকলকে কেবল হাসাইতে লাগিলেন। সেই হাসিতে কোন সঙ্কীর্ণতা বা অনুদারতা ছিল না। সেই হাসির স্রোতে জাতীয় চরিত্রের মলিনতা ধৌত করিয়া ফেলাই তাঁহার বাসনা ছিল।

অল্পদিন পরেই তিনি 'কল্কি-অবতার' নামে এক প্রহসন রচনা করিলেন। ইহাতে তিনি হিন্দুসমাজের অন্তর্গত সমস্ত সম্প্রদায়কেই হাস্যাস্পদ করিয়াছেন। 'বিলেতফেরৎ, ব্রাহ্ম, গোঁড়া, পণ্ডিত, নব্যহিন্দু' —ইহাদের কাহাকেও তিনি ছাড়িয়া কথা কহেন নাই। বিশ্বকর্ম্মা ব্রহ্মার নিকট বিলেতফেরতাদের এইরূপ পরিচয় দিতেছেন—

বিলেতফের্ত্তা নামক আর এক সম্প্রদায় হইবে; তাহারা ভিতরে সাহস প্রভৃতি সদ্গুণ ও বাহিরের বর্ণ ভিন্ন সব বিষয়ে সাহেবদিগের বে'ল আনা মাত্রার অনুবর্ত্তী

হইবে। তাহারা ধুতি চাদর নিষিদ্ধ বিবেচনা করিয়া বাড়ীতে পাজামা ও বাহিরে হ্যাট্‌কোট পরিয়া আত্মবিশেষত্ব অনুভব করিবে। তাম্বূলচর্ব্বণ, গুড়গুড়িতে ধূমপান, গুরুজনকে প্রণাম—এক কথায়—সমস্ত দেশীয় রীতিনীতির প্রতি তাহাদের দারুণ বিতৃষ্ণা জন্মিবে। তাহারা মাতৃভাষায় কথা কহিতে কুণ্ঠিত হইবে; এবং কেবল কুলি-সম্প্রদায়ের সহিত এড়ো ভাষায় বাঙ্গালা হিন্দী কহিতে সক্ষম হইবে। তাহারা ইংরাজী শ্ল্যাং প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিবে; ইংরাজী সুরে শিষ দিবে; ছড়ি ঘুরাইয়া বীরদর্পে চলিবে; হুইস্কি খাইবে এবং পদদ্বয় যতদূর সম্ভব দ্বিধা প্রসারিত করিয়া চুরোট টানিবে।'

কয়েক বৎসর পরে তাঁহার এই উক্তিই "আমাদের বিলেতফের্ত্তা ক'ভাই" নামক হাসির গানে রূপান্তরিত হইয়া সর্ব্বজনবিদিত হইয়া গিয়াছে। অবশ্য দ্বিজেন্দ্রলালের এই উক্তি সকল বিলেতফেরতার প্রতিই প্রযোজ্য নয়, এবং বাহ্য লক্ষণ মাত্র দেখিয়াই মানুষকে সব সময় বিচার করাও চলে না। আর এই শ্রেণীর বিলেত-ফেরতা ও আজকাল আর বড় দেখা যায় না।

অতঃপর দ্বিজেন্দ্রলাল যে-সকল ব্যঙ্গ কবিতা ও হাসির গান লিখিতে লাগিলেন, সেগুলি সকলের এতই পরিচিত যে এ প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে কিছু না বলিলেও চলে। ব্যঙ্গের অন্তরালে বেদনা, হাস্যের সহিত অশ্রুরেখা এই গানগুলিতে তাঁহার অকপট স্বদেশপ্রেমিক হৃদয়টিকে দেশের সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছে। তিনি এখন আর নিজেকে তাঁহার স্বদেশবাসিগণ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করেন না! দেশের দুঃখ, দৈন্য, লজ্জা, এমন কি তাহার দোষসমূহেরও তিনি অংশভাগী, সুতরাং তিনি যাহাদিগকে ব্যঙ্গ করিতেছেন, তাহাদের মধ্যে তিনি নিজেও একজন, তাহা তিনি বিস্মৃত হন নাই, এবং বিদ্রূপকারী ও বিদ্রূপের বস্তু এই উভয়ের মধ্যে যে কোন পার্থক্য বা ব্যবধান নাই তাহা তিনি অকুণ্ঠিতভাবে প্রকাশ

করিয়াছেন। তাই তাঁহার রসকৌতুকপূর্ণ অথচ ব্যঙ্গমূলক হাসির গান লোকের এত প্রিয় হইয়াছে।

কিন্তু শুধু দোষ দেখাইয়া কি ব্যঙ্গ করিয়া দেশের যে-হিতসাধন করা যায় তাহা আংশিক মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে জাতিকে নূতন ভাব দিতে হইবে এবং যদি তাহার গৌরব করিবার কিছু থাকে, তাহাকে তাহা স্মরণ করাইয়া তাহার পদদলিত অবমানিত প্রাণে আত্মমর্য্যাদা উদ্দীপিত করিয়া দিতে হইবে। ইহাই প্রকৃত দেশভক্তের কাজ। দ্বিজেন্দ্রলাল তাহা বুঝিতেন। তাই যখন তিনি দেখিলেন যে ব্যঙ্গবিদ্রূপ যথেষ্ট হইয়াছে, তখন তিনি ভারতগৌরব রাজপুত জাতির ইতিহাস হইতে স্বদেশপ্রেম ও মনুষ্যত্বের মহোন্নত আদর্শ বাঙ্গালী জাতির সম্মুখে উজ্জ্বলভাবে ধরিয়া 'রাণা প্রতাপ', 'দুর্গাদাস,' ও 'মেবার পতন,' নামক নাটকত্রয় রচনা করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য বিফল হয় নাই। এই নাটকগুলি রঙ্গালয়ে অভিনীত হইয়া শত সহস্র বাঙ্গালীর প্রাণে যে উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছে তাহার বন্যায় জাতীয় চরিত্রের অনেক পঙ্কিলতা ধৌত হইয়া গিয়াছে।

(২)

'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, তিনি দুঃখবাদী (Pessimist) ও ঈশ্বরবিশ্বাসহীন ছিলেন। আমরা তাঁহার এ মন্তব্য ভ্রান্ত বলিয়া মনে করি। যিনি 'পরপারে' নাটক লিখিয়াছেন, এবং

মহাসিন্ধুর ও-পারের সঙ্গীতের আভাস পাইয়াছিলেন, তিনি কখনও নাস্তিক হইতে পারেন না! তবে এক সময়ে হয়ত তিনি অজ্ঞেয়বাদী (agnostic) ছিলেন। 'মন্দ্রে'র একটি কবিতায় তিনি বলিতেছেন—

"মরণের পাছে
কি জগৎ লুকায়িত আছে।
এই কৃষ্ণ জলধির পারে
কোন্ দেশ আছে! * *
কিংবা এইখানে শেষ সব।"

কিন্তু তিনি প্রথম ও শেষ জীবনে যে ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিলেন, তাহার প্রমাণ তাঁহার রচনাবলীতেই রহিয়াছে। তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আর্য্যগাথা'র ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছিলেন—"যদি কেহ প্রকৃতিকে দেখিতে দেখিতে কখন কখন প্রকৃতি-রচয়িতার অনন্ত মহিমায় স্তব্ধ হইয়া থাকেন * * * 'আর্য্যগাথা' তাঁহারই আদর চাহে।" ইহা কি অবিশ্বাসীর কথা? যদি কেহ বলেন যে তরুণ যৌবনে তাঁহার এরূপ ভাব থাকিলেও পরে একেবারে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তদুত্তরে 'মেবার পতন' নাটকের ভূমিকা হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তিনি বলিতেছেন,—'আমি' হইতে যতদূর প্রেমকে ব্যাপ্ত করা যায়, ততই সে ঈশ্বরের কাছে যায়। ঈশ্বরে লীন হইলে সে প্রেম পরিপূর্ণতা লাভ করে। সেই ঐশ-প্রেম এখানে দেখানো হয় নাই। নাটকান্তরে তাহা দেখাইবার ইচ্ছা রহিল।" যিনি ঐশ-প্রেমের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য নাটক পর্য্যন্ত লিখিবার কল্পনা করিয়াছিলেন, তিনি যে ঈশ্বরে আস্থাহীন ছিলেন, এরূপ কথা কি করিয়া মানিয়া লওয়া যায়? মনে রাখিতে হইবে, 'মেবার পতন'.

দ্বিজেন্দ্রলালের পরিণত বয়সের রচনা। সুতরাং যদি বা কোন সময়ে তাঁহার মনে ঈশ্বর বা পরকাল সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে, সে সংশয় যে স্থায়ী হয় নাই তাহা আমরা দেখিতে পাইতেছি। তবে এ কথা সত্য যে তিনি লৌকিক হিন্দুধর্ম্মের স্বর্গ, নরক, দেবদেবী ইত্যাদি বিশ্বাস করিতেন না, এবং তাঁহার মধ্যে ভক্তিভাবটা বোধ হয় তেমন প্রবল ছিল না। কিন্তু ইহা যে নাস্তিকতার লক্ষণ, তাহা অবশ্য কেহই বলিবেন না। কারণ, অনেক শিক্ষিত হিন্দুই স্বর্গ, নরক, দেবদেবী প্রভৃতিকে কবি-কল্পনা মাত্র বলিয়াই মনে করেন, ঈশ্বর-বিশ্বাসের সহিত ইহাদের সম্বন্ধ তাঁহারা স্বীকার করেন না।

ভক্তির অভাববশতঃ দ্বিজেন্দ্রলাল আধ্যাত্মিক কবিতা রচনা করেন নাই, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। কারণ, তাঁহার মৃত্যুর দেড় বৎসর পূর্ব্বে 'বাণী' পত্রিকায় তাঁহার যে একটি গান প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা শুধু আধ্যাত্মিক নহে, তাহার প্রেমগদ্‌গদ্‌ আত্মসমর্পণের ভাবটি এমনই মধুর যে এখানে সেটির কিয়দংশ উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। গানটি এই—

"তুমি যে আমার হৃদয়েশ্বর
তুমি যে প্রাণের প্রাণ;
কি দিব তোমায়, যা আছে আমার
সকলি তোমারই দান।
চরণের লঘু ভঙ্গিম গতি,
হৃদয়ের বেগ কম্পিত অতি,
অধরের হাসি নয়নের জ্যোতি,
কণ্ঠের মৃদু গান;

সকলি তোমারই দান—সে যে সখা
সকলি তোমারই দান।

*　　*　　*　　*

চেয়ে দেখ ঐ সন্ধ্যা আকাশে
দিবসের আলো ম্লান হয়ে আসে,
মিশে যায় আশা হুতাশের খাসে,
থেমে যায় হাসি গান ;
ফুরায়ে গিয়াছে যা ছিল আমার,
আর কেন বঁধু—চেয়োনাকো আর,—
আর কিছু নাই তোমায় দিবার,
হ'ল দিবা অবসান ;
আর কেন বঁধু ?—লহ লহ তবে
এ জীবন বলিদান।"

দ্বিজেন্দ্রলাল আর কোন ভগবদ্-বিষয়ক গান বা কবিতা রচনা করিয়াছেন কি না তাহা জানি না। কিন্তু এই একটি গানেই তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত প্রেম ও ভক্তি তাঁহার 'প্রাণের প্রাণ' 'হৃদয়েশ্বরের' দিকে উচ্ছ্বসিতবেগে ছুটিয়া গিয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল যে দুঃখবাদী ছিলেন না তাহা তাঁহার কাব্য ও প্রবন্ধ হইতে প্রদর্শিত হইতে পারে। একটি কবিতায় তাঁহার নবজাত সন্তানকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তিনি বলিতেছেন—

"এস ধরাধামে বৎস। হেথা বিশ্বময়
সর্ব্বৈব কদর্য্য নহে। নহে সমুদয়
ঝটিকা, অশ্রান্তগর্জ্জি বজ্র, অন্ধকার,
কণ্টক, অরণ্য, শুষ্ক মরুভূমি সার।

আছে ঊর্দ্ধে নীলাকাশ—শান্ত দিব্য স্থির,
অনন্ত অভয় ভরা স্নিগ্ধ সুগভীর
স্নেহে বক্ষে ধরি' ধরণীরে। * *
নহে সবই কালসর্প কীট ও কণ্টক,
নহে সবই প্লীহা, যক্ষ্মা, জ্বর, বিস্ফোটক
হেথা।—আছে বিশ্বে নব শৈশবের মত্ত
উচ্ছৃঙ্খল ক্রীড়া, যৌবনের চিরস্বত্ব—
প্রেমের রাজত্ব, বার্দ্ধক্যেও ক্ষীণ আশা;
আছে চিরপবিত্র মাতার ভালবাসা,
চির প্রবাহিত নির্ঝরের ধারাসম
অবারিত, উৎসারিত, নিত্য মনোরম,
চিরস্নিগ্ধ; সেই স্নেহ কভু নাহি যাচে
প্রতিদান। হেথা দুঃখ আছে, সুখ আছে,
মিথ্যা আছে, সত্য আছে, উদ্বেগ ও ভয়
আছে; শান্তি ও ভরসা আছে। বিশ্বময়
সব স্থানে তুঁষ মধ্যে ধান্য আছে। তবে
শুধু সেইটুকু বৎস বেছে নিতে হবে।"

ইহা দুঃখবাদীর উক্তি নহে। অপর একটী কবিতায় তিনি বলিতেছেন—

"কে চাহে করিতে ত্যাগ এমন ধরণী,
এমন জগৎ আমাদের?"

আর যিনি পৃথিবীর সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইয়া গাহিয়াছেন—

"একি মধুর ছন্দ, মধুর গন্ধ, পবন মন্দ মন্থর—
একি মধুর মুঞ্জরিত নিকুঞ্জ পত্রপুঞ্জ মর্ম্মর।"

তিনি কখনও দুঃখবাদী হইতে পারেন না।

এই প্রসঙ্গে আমার একটি কথা মনে পড়িতেছে। দ্বিজেন্দ্রলাল একবার রবীন্দ্রনাথের মেঘদূত ব্যাখ্যার সমালোচনা করিতে গিয়া তাঁহাকে দুঃখবাদী বলিয়া নিন্দা করিয়াছিলেন। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি নিজে পৃথিবী দুঃখময় মনে করিতেন না। এই প্রবন্ধে তিনি বলিতেছেন—"পৃথিবীর সম্বন্ধে মানুষের সম্বন্ধে খারাপ ধারণা কবি-জনোচিত কি না বলিতে পারি না। * * * আমি ত বিবেচনা করি যে মর্ত্ত্যের মানুষ একটা মহামহিমান্বিত সৃষ্টি। সে ধূলির উপর দাঁড়াইয়া সদর্পে সূর্য্যের পানে চাহিয়া বলিতে পারে—'তুমি সূর্য্য বটে, কিন্তু মানুষ নও।' মানুষের স্নেহ, দয়া, কৃতজ্ঞতা, মানুষের বুদ্ধি, মানুষের ত্যাগ পরম সুন্দর। তাহার কাছে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত ছার।"*

রবীন্দ্রনাথকে দ্বিজেন্দ্রলাল ভুল বুঝিয়াছিলেন। যিনি দুঃখকে ঈশ্বরের মূর্ত্তিরূপে কল্পনা করিয়া গাহিয়াছেন—

"দুঃখের বেশে এসেছ বলে'
তোমারে নাহি ডরিব হে,
যেথায় ব্যথা সেথায় তোমা
নিবিড় ক'রে ধরিব হে।"

তিনি দুঃখবাদী নহেন। দেবকুমার বাবুও দ্বিজেন্দ্রলালের বিশেষ অন্তরঙ্গ এবং ভক্ত হইয়াও তাঁহার সম্বন্ধে ভুল করিয়াছেন।

---

* "অর্চ্চনা," ১৩১৭ সাল।

জীবন-চরিতে দ্বিজেন্দ্রলাল

জীবনচরিত হইতে কবিকে সব সময়ে যে চিনিতে পারা যাহা তাহা নহে। টেনিসনের জীবনচরিত পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন,—"কবি কোথায়, কাব্যস্রোত কোন্ গুহা হইতে প্রবাহিত হইতেছে তাহাত খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ইহা টেনিসনের জীবনচরিত হইতে পারে, কিন্তু কবির জীবনচরিত নহে। আমরা বুঝিতে পারিলাম না কবি কবে মানবহৃদয়-সমুদ্রের মধ্যে জাল ফেলিয়া এত জ্ঞান ও ভাব আহরণ করিলেন এবং কোথায় বসিয়া বিশ্বসঙ্গীতের সুরগুলি তাঁহার বাঁশীতে অভ্যাস করিয়া লইলেন।"—ইহার কারণও তিনি দিয়াছেন। "কবি কবিতা যেমন করিয়া রচনা করিয়াছেন জীবন তেমন করিয়া রচনা করেন নাই। তাঁহার জীবন কাব্য নহে।"

কিন্তু তাই বলিয়া কি কবির জীবনচরিতের কোন প্রয়োজন নাই? আমরা মনে করি, আছে। কিন্তু তাহা এরূপ হওয়া চাই যে কবির জীবন ও তাঁহার কাব্যের মধ্যে যদি কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে তাহা যেন আমাদের বুঝাইয়া দিতে পারে। যে জীবনচরিত একজন প্রতিভাবান্ ব্যক্তির কাহিনীমাত্র, যাহা কবির জীবনযাত্রা-সম্বন্ধে পাঠকের কৌতূহল মাত্র চরিতার্থ করে, তদধিক কোন মহত্তর সত্যের সন্ধান দিতে পারে না, তাহার কোন মূল্য নাই।

শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী প্রণীত দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনচরিত পড়িয়াও আমরা নিরাশ হইয়াছি। যে সূক্ষ্ম বিচারশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টি থাকিলে কবির কার্য্য-কলাপের সুসঙ্গত, অর্থপূর্ণ ব্যাখ্যা ও তাঁহার

অসাধারণ চিত্তের বিকাশ ও পরিণতি প্রদর্শন সম্ভবপর হয়, তাহার অভাবে দেবকুমার বাবুর গ্রন্থখানি কেবল অনাবশ্যক আলোচনায় এবং অসার বাগাড়ম্বরে ভারাক্রান্ত হইয়াছে। এই সব বাগ্‌জালের মধ্য হইতে আসল খাঁটি কবিটিকে চিনিতে পারা একরূপ প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে। আবার তাঁহার সম্বন্ধে যে সব গল্প পুস্তকে বর্ণিত দেখিতে পাই, সেগুলির অধিকাংশই এরূপ তুচ্ছ যে, সে সব গল্প একজন অতি সাধারণ ব্যক্তির সম্পর্কেও বলিবার কোন প্রয়োজন হয় না।

দু' একটি উদাহরণ দিই। দ্বিজেন্দ্রলাল বাল্যকালে একদিন তাঁহার অগ্রজকে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিতে শুনিয়া নিজে শব্দরূপ আওড়াইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যে ভবিষ্যতে একজন খুব মেধাবী পুরুষ বলিয়া পরিচিত হইবেন. তাহার আভাস এইখানেই পাওয়া গেল।

আর একটি গল্প এই যে, আলিপুরে তিনি যখন ট্রেজরি অফিসার ছিলেন, তখন একদিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাছারিতে থাকিয়া পেন্‌সনপ্রাপ্ত বৃদ্ধগণ যাহাতে সেইদিনই তাঁহাদের পেন্‌সন্ পান তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং বৃদ্ধদের প্রতি যে তিনি কত দয়ালু ছিলেন, জীবনচরিত-লেখক তাহার প্রমাণ পাইলেন।

যৌবনে দ্বিজেন্দ্রলাল একবার একটা প্রদর্শনীতে কয়েকজন ফিরিঙ্গি কর্তৃক কয়েকটি বঙ্গমহিলাকে অপমানিত হইতে দেখিয়া দুরাত্মাদিগকে কিরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন দেবকুমার বাবু তাহার এক পঞ্চপৃষ্ঠাব্যাপী বর্ণনা দিয়াছেন। যাহার উল্লেখমাত্রই যথেষ্ট হইত, তাহাকে একটি খণ্ড-যুদ্ধের আকার দান করিয়া লেখক দ্বিজেন্দ্রলালের ন্যায় অসাধারণ ব্যক্তির গৌরবহানিই করিয়াছেন। কারণ, যেরূপ অবস্থায় তিনি ফিরিঙ্গি

দিগের সহিত লড়াই করিয়াছিলেন সেরূপ অবস্থায় নিতান্ত কাপুরুষ ব্যতীত কেহ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না।

এবংবিধ গল্পে দ্বিজেন্দ্রলালের যথাযথ পরিচয় পাওয়া যায় না। আমাদের এই অধঃপতিত, অবজ্ঞাত দেশে এমন একজন সাহিত্যিক আবির্ভূত হইয়াছিলেন যাঁহার পৌরুষ, তেজস্বিতা, দৃঢ়তা, আন্তরিকতা ও সর্বোপরি স্বদেশ-প্রেম সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়া জাতীয় চরিত্রের উন্নয়নে নিয়োজিত হইয়াছে, যাঁহার হাসি ও অশ্রু আলোকোজ্জ্বল মুক্তা-ফলের ন্যায় বঙ্গবাণীর বক্ষে ঝলমল করিতেছে, যাঁহার উচ্ছ্বসিত সঙ্গীতধারা, উদ্দীপনার প্রবল প্রবাহ সৃষ্টি করিয়া জাতীয় জীবনকে সুন্দর এবং সাহিত্যক্ষেত্রকে স্নিগ্ধ সরস করিতে কার্পণ্য করে নাই, যিনি নানাদুঃখপীড়িত নিরানন্দ বাঙ্গালীজাতিকে অনাবিল আনন্দ-রসে ডুবাইতে জানিতেন, আবার উচ্চ আদর্শের ধ্রুবলোকে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া জাতীয় তরণী বাহিয়া চলিতেও শিক্ষা দিয়াছেন।

আমাদের সৌভাগ্য যে, দেশ যখন নবযুগের আশা আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত, যখন সমাজে ও সাহিত্যে এই নব জাগরণের একটা বিপুল সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল, তখনই দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার দেশের তথা জননী বঙ্গভাষার পৌরোহিত্যে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে শুধু কবি বা ভাবুকরূপে দেখিলে বোধ হয় তাঁহার প্রতি ঠিক সুবিচার করা হয় না। কারণ, তিনি কবিত্বে বা ভাবুকতায় যত বড়, দেশহিতৈষণায় তিনি তদপেক্ষা বেশী বড়। সত্য বটে, জননী বঙ্গভাষার 'অমল চরণ' কমলে' স্থান লাভের জন্য তিনি তাঁহার সেবা করিতে কোনরূপ ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু তাহা

হইলেও সাহিত্য তাঁহার হস্তে স্বদেশ-মন্ত্র সাধনের যন্ত্র বা অস্ত্রস্বরূপ ছিল, বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথের ন্যায় একাগ্র সাধনার সামগ্রী ছিল না ;—দেশই ছিল তাঁহার 'সাধনা,' তাঁহার 'দেবী', তাঁহার 'স্বর্গ'। সুতরাং সাহিত্য-সৃষ্টি বিষয়ে তিনি যদি বঙ্কিম-রবীন্দ্রের সমকক্ষ বিবেচিত না-ও হন, যদি তাঁহার নাটকগুলির অধিকাংশ সাহিত্য হিসাবে উৎকৃষ্ট না-ও হইয়া থাকে, পরন্তু লোকশিক্ষাই যদি সেগুলির পরম উদ্দেশ্য ও চরম সার্থকতা হয়, তাহা হইলেও আক্ষেপের বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু দেশাত্মবোধ তাঁহার সাহিত্যে কত খানি মূর্ত্তিলাভ করিয়াছে, বঙ্কিমের বন্দে মাতরং মন্ত্র এবং রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার সহিত দ্বিজেন্দ্রলালের উদ্দীপনা মিলিত হইয়া জাতীয় আন্দোলন-ধারাকে যে ত্রিধারা-সঙ্গমের মাহাত্ম্য দান করিয়াছে, তাহাতে দ্বিজেন্দ্রলালের গৌরব ও কৃতিত্ব কতখানি—ইহারই বিচার দ্বিজেন্দ্র লালের জীবনালোচনায় সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা।

কিন্তু তাঁহার জীবনচরিতকার এদিক দিয়া তাঁহার জীবন-পর্য্যালোচনা না করিয়া তাঁহাকে রবীন্দ্রনাথের ন্যায়ই প্রতিভাসম্পন্নরূপে আমাদের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন। একস্থলে দেবকুমার বাবু লিখিয়াছেন,—যখন বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশের এই দুই উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক—**দিবাকর রবি ও দ্বিজরাজ চন্দ্রমা** সতত এইরূপে নিয়মিতভাবে সম্মিলিত হইতেন, যখন তাঁহারা উভয়ে নবনবোন্মেষশালিনী, বিশ্ববিজয়িনী অপূর্ব্ব শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবিস্ময়-সঞ্জাত অনুরাগে একে অন্যের প্রতি আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছেন, এই ভাগ্যহত দেশের পক্ষে তাহা কি গৌরবের ও আনন্দের দিনই না ছিল! অত বড় দুইটি প্রতিভার একত্র সন্নিবেশ ঘটিলে একের পক্ষে অন্যের নিকট হইতে

শক্তির সাহায্য গ্রহণ করা একান্ত অনিবার্য্য এবং নিতান্তই স্বাভাবিক।"

এই মন্তব্য নিতান্ত অসঙ্গত ও অসমীচীন। কারণ, যে সময়ের কথা লেখক এখানে বলিতেছেন সে সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অলোকসামান্য প্রতিভালোকে দেশবাসীর নয়ন ঝলসিয়া দিতেছিলেন, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের তখন পর্য্যন্ত 'হাসির গান,' 'আষাঢ়ে', 'মন্দ্র' ও দুই একখানি নাটক-প্রহসন ব্যতীত আর কিছুই রচিত হয় নাই। তিনি তখনও 'হাসির গানের কবি' বলিয়াই পরিচিত। সুতরাং তিনি রবীন্দ্রনাথেরই ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন, ("অত বড় দুইটি প্রতিভা") উভয়েরই শক্তি "বিশ্ববিজয়িনী", শুধু তাহাই নহে, পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান "একান্তই অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল", এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া লেখক অত্যন্ত বিচারমূঢ়তার পরিচয় দিয়াছেন।

উত্তরকালে যখন দ্বিজেন্দ্রলালের যশোরশ্মি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তখনও শুধু রবীন্দ্রনাথেরই প্রতিভা বিশ্ববিজয়িনী বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল, দ্বিজেন্দ্রলালের নয়। আর "একের পক্ষে অন্যের নিকট হইতে শক্তির সাহায্য গ্রহণ" করা সম্বন্ধে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে উভয়েই ভণ্ডামি ও গোঁড়ামির ঘোর শত্রু ছিলেন, এবং উভয়েই নানাবিধ সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভাবের আদান প্রদানের কথা উঠিলে ব্যাপারটা অত্যন্ত হাস্যকর হইয়া দাঁড়ায়।

রবীন্দ্রনাথ উদীয়মান দ্বিজেন্দ্রলালের "আষাঢ়ে" ও "মন্দ্র" কাব্যদ্বয়ের প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা করিয়া সাহিত্য-সমাজে তাঁহার প্রতিষ্ঠা লাভের পথ সুগম করিয়া দেন।' তিনি যে দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বারা কোনপ্রকারে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন এরূপ কথা অত্যন্ত অশ্রদ্ধেয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের উপরও যে রবীন্দ্রনাথের খুব বেশী প্রভাব সঞ্চারিত হইয়াছিল এমন কথাও বোধ হয় বলা যাইতে পারে না। কারণ, তাঁহার রচনাবলীতে রবীন্দ্র-প্রভাবের প্রমাণ অধিক পাওয়া যায় না।

কেহ যেন মনে না করেন যে, আমরা দ্বিজেন্দ্রলালকে খর্ব্ব করিতে চাহি। আমরা শুধু এই কথা বলিতে চাহি যে তাঁহার মহত্ত্ব শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সৃজনে নহে, সাহিত্যের দ্বারা স্বদেশ-সেবায়; ভাবরাজ্যের মণিমুক্তা আহরণে নহে, সমাজে প্রাণ-শক্তির সঞ্চার-চেষ্টায়। ইহাও কি কম গৌরবের কথা?

বিদ্যাসাগর মহাশয় সাহিত্যিক হিসাবে তাঁহার সমসাময়িক বঙ্কিম-চন্দ্রের তুল্য মর্য্যাদা কখনই লাভ করেন নাই, কিন্তু সমাজ-সেবায় ও দেশের কল্যাণে আত্মোৎসর্গের জন্য কাহার গৌরব বেশী? শুধু আনন্দদান ও তৎসহ চিরন্তন সত্যের প্রচারের জন্য যতটা না হউক, সাহিত্যকে দেশসেবা ও লোকশিক্ষার বাহন করাতেই তাঁহার সমধিক কৃতিত্ব।

এখানে হয়ত প্রশ্ন হইবে, উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্য কি প্রথম শ্রেণীর হইতে পারে না? এরূপ ব্যাপার যে একেবারে অসম্ভব, তাহা আমরা বলিতেছি না। কিন্তু দেখা গিয়াছে, প্রথমশ্রেণীর প্রতিভাও উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দিতে গিয়া নিজেকে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্রেরই নাম করা যাইতে পারে। তাঁহার "আনন্দ মঠ" বা 'দেবী-চৌধুরাণী' যে সাহিত্য-হিসাবে 'বিষবৃক্ষ' বা 'কৃষ্ণকান্তের উইল' অপেক্ষা নিকৃষ্টতর তাহা অস্বীকার করা চলে না। দ্বিজেন্দ্রলালেরও 'শাজাহান,' 'নূরজাহান' প্রভৃতি যে দু'একখানি উদ্দেশ্য-নিরপেক্ষ নাটকাদি আছে, সেগুলি তাঁহার উদ্দেশ্যমূলক 'দুর্গাদাস' বা 'মেবার পতন' অপেক্ষা

উৎকৃষ্ট। ইহার কারণও বুঝিতে পারা যায়। শ্রেষ্ঠ প্রতিভার ধারাই এই যে যখন তাহা অব্যাহত থাকে, তখনই তাহার মাহাত্ম্য পূর্ণ প্রকটিত হয়, সচেষ্ট বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিলেই তাহার শ্রেষ্ঠতা নষ্ট হইয়া যায়। ইহার প্রেরণা কবির অন্তরবাসিনী এক রহস্যময়ী শক্তি হইতে আসে, দেশকালের প্রয়োজন ইহাকে পূর্ণমাত্রায় অনুপ্রাণিত করিতে পারে না, উদ্দেশ্যের গণ্ডীমধ্যেও নিজেকে আবদ্ধ রাখিতে পারে না। তাই শ্রেষ্ঠ প্রতিভা যাহা, তাহা চিরদিনের, তাহা অক্ষয়; কিন্তু বহিঃপ্রেরণাসঞ্জাত উদ্দেশ্য-মূলক সাহিত্য চিরন্তন নহে, তাহা তাহার সাময়িক কার্য্য সম্পাদন করিয়াই প্রায় গৌরবহীন হইয়া পড়ে, হয়ত বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া যায়।

দেশের কল্যাণ-কামনাই যে দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য-সেবার মূল মন্ত্র ছিল তাহা প্রবন্ধান্তরে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। এই দেশ-হিতৈষণাই তাঁহাকে রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতায় প্ররোচিত করিয়াছিল। তিনি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতেন যে; রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি কবিতা ও গান দুর্নীতিমূলক এবং তাঁহার অস্পষ্ট কবিতাগুলি শ্রেষ্ঠ কবিত্বের দাবী করিতে পারে না,—শুধু নব্য কবি-সম্প্রদায়ের সম্মুখে কবিত্বের একটা ভ্রান্ত আদর্শ প্রচার করিতেছে। সুতরাং তাঁহার পক্ষে রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করা অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। এই ব্যাপারটি হইতে আমরা তাঁহার সাহিত্যিক ও চরিত্রগত দোষগুণ উভয়ই কিয়ৎ পরিমাণে দেখিতে পাই। একদিকে যেমন তাঁহার উদ্দেশ্যের সাধুতা ও আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ নাই, অপর দিকে তেমনই আবার সাহিত্য-বিচার সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্কীর্ণতা ও ভ্রান্তি তাঁহারই কবি

জীবনকে বিড়ম্বিত করিতেছে। রবীন্দ্রনাথের যে সব কবিতা ও গান দ্বিজেন্দ্রলাল দুর্নীতিমূলক বলিয়া আক্রমণ করিয়াছিলেন, আমরা সেগুলি নির্দ্দোষ বলিয়া মনে করি, এবং তাঁহার বিরুদ্ধে অস্পষ্টতার অপবাদও বিচারসহ নহে। এ সম্বন্ধে এত বেশী আলোচনা হইয়া গিয়াছে যে এখানে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি না। কিন্তু দেবকুমার বাবু এ সম্বন্ধে নিজের স্বাধীন মত ব্যক্ত না করিয়া যেরূপভাবে বিষয়টির অবতারণা করিয়াছেন তাহা একেবারেই সঙ্গত হয় নাই। তাই দু'এক কথা বলিতে হইতেছে।

বিখ্যাত ইংরাজ সমালোচক সেণ্টস্‌বেরি তাঁহার History of English Literature in the Nineteenth Century নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, "গীতি-কবিতায় যাঁহারা অর্থকেই প্রাধান্য দেন, তাঁহাদের নিকট ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কয়েকটি কবিতা এবং শেলীর অনেক কবিতা সমাদৃত হইবে না, কিন্তু তাহা হইলেও এই সকল কবিতাই ইংরাজি সাহিত্যের গৌরব।" রবীন্দ্রনাথের অস্পষ্ট কবিতাগুলি সম্বন্ধেও আমরা এই কথা বলিতে চাই। এমন অনেক রহস্যময় ভাব আছে—

> "জীবনে যা চিরদিন র'য়ে গেছে আভাসে,
> প্রভাতের আলোকে যা ফোটে নাই প্রকাশে।"

এই সকল ক্ষণিক উপলব্ধি অথচ গভীর সত্যকে কবি যখনই ভাষায় বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তখনই তাহা অস্পষ্ট ও শুধু ইঙ্গিতময় গানের সৃষ্টি করিয়াছে। কখনই

> "কথা তারে শেষ করে' পারে নাই বাঁধিতে,
> গান তারে সুর দিয়ে পারে নাই সাধিতে,"

এইরূপ ইঙ্গিতাত্মক কবিতা মনের মধ্যে একটা সুনির্দ্দিষ্ট অর্থের আভাস না আনিয়া দিলেও, হৃদয়ে একটা যে ভাবের আলোড়ন উপস্থিত করে তাহাতেই ইহার সার্থকতা। ইহা অনুভূতির সামগ্রী, যুক্তিতর্কের বিষয় হইতে পারে না। দ্বিজেন্দ্রলাল যে এ সকল কবিতা বুঝিতে পারেন নাই, তাহার কারণ তাঁহার মন ছিল। অত্যন্ত যুক্তিপ্রবণ এই জন্যই প্রতিভার ঐশী প্রেরণা তিনি বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। আর তিনি যে 'সোনার তরী' লইয়া পরলোকগত সাহিত্যরসিক মনীষী লোকেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয়ের সঙ্গে তিন দিন ধরিয়া ক্রমাগত তর্ক করিয়াছিলেন, তাহাতেও ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অনেক কবিতাতেও তিনি এই যুক্তিপ্রিয়তার পরিচয় দিয়াছেন। 'মন্দ্রে' একটি কবিতায় তিনি এইরূপে প্রেমের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিতেছেন—

"এই প্রেম, এই ঈপ্সা শুধু কাম, শুধু লিপ্সা,
এ শুদ্ধ বিধির বিধি ভবে
রাখিতে তাঁহার সৃষ্টি; আর এই রূপ-বৃষ্টি
প্রলোভনে বাঁধিতে মানবে।"—

(কুসুমে কণ্টক।)

ইহা বিজ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু কাব্যের অন্ত্যেষ্টিসৎকার। সুতরাং দ্বিজেন্দ্রলাল যে 'পুরাতন ভৃত্যকে' 'সোনার তরী'র উপরে আসন দিবেন তাহা বিচিত্র নহে।

দুর্নীতি-প্রচারের অপবাদও একা দ্বিজেন্দ্রলাল ব্যতীত আর কোন বিশিষ্ট সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আনয়ন করেন নাই। তিনি সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়াই এই যোদ্ধৃবেশ ধারণ করিয়াছিলেন; কিন্তু

তাহা হইলেও কালের কষ্টিপাথরে 'চিত্রাঙ্গদা' অফুরান সৌন্দর্য্য ও আনন্দের খনিস্বরূপ হইয়া বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডার চির সমৃদ্ধ করিয়া রাখিবে, আর যে সকল প্রেমের গান তিনি অভিসার-সঙ্গীত বলিয়া সাহিত্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, সেগুলিও চিরকাল আমাদেরই তরুণ-তরুণীর "পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, মান, অভিমান" এর গীতরূপে তাহাদের দাম্পত্য জীবনকে মধুর ও সুন্দর করিতে সহায়তা করিবে। 'সে আসে ধীরে' 'কেন যামিনী না যেতে জাগালে না' প্রভৃতি কয়েকটি সঙ্গীতে একটা কুঞ্জবন কল্পিত হইয়াছে বলিয়াই কি এগুলিকে অভিসারের গান বলিতে হইবে?

কবিকল্পনা কি নিতান্ত সাধারণ শয়নাগারকে idealise বা আদর্শীভূত করিয়া সৌন্দর্য্যময় কুঞ্জবন বা প্রমোদোদ্যানে রূপান্তরিত করিতে পারে না? ইহাতেই ত কাব্যের সার্থকতা। 'সে আসে ধীরে, যায় লাজে ফিরে'—ইহা কি কুলটা অভিসারিকার চিত্র? না, 'কম্প্র বক্ষে, নম্র আঁখিপাতে' স্বামিসকাশে গমনশীলা, নববিবাহিতা বঙ্গবধূর যথাযথ অথচ অতিসুন্দর আলেখ্য?

'কেন যামিনী না যেতে জাগালে না, বেলা হ'ল মরি লাজে!' এই সলজ্জ-করুণ অনুযোগ কতদিন কত বিলম্বে নিদ্রোত্থিতা নববধূর মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। শয়নকক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া পরিজনবর্গের সম্মুখীন হওয়া তাহার পক্ষে এতই লজ্জাকর যে তাহার মনে হয় সে যেন 'চলিবে পথেরি মাঝে'।

লজ্জাবিমূঢ়ার এই একান্ত সঙ্কোচ যে গানে আপনার ভাষা লাভ করিয়া সার্থক হইয়াছে তাহা কি দুর্নীতিমূলক?

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে দ্বিজেন্দ্রলাল এই সব গান ঘোরতর দুর্নীতি-

মূলক মনে করিয়া রবীন্দ্রনাথের পৃষ্ঠে কশাঘাতের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এই উদ্দেশ্যসাধন কল্পে তিনি ঐ সকল গান প্যারডি করিয়া 'আনন্দবিদায়' রচনা করিলেন। এই ব্যঙ্গনাট্যখানির প্রকাশ ও অভিনয় তাঁহার অমল যশোরাশির মধ্যে কলঙ্ক আনিয়া দিয়াছে, এ কথা আমাদিগকে দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে।

দেবকুমার বাবু বলেন যে ষ্টার থিয়েটারে উক্ত নাটকের অভিনয়ের পর তিনি আপন দোষ বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমরা জানি তাহা ঠিক নয়। তিনি যে ইহা অন্যায় বলিয়া স্বীকার করেন নাই, এবং এজন্য অনুতপ্তও হন নাই তাহার প্রমাণ আছে। যখন তিনি 'আনন্দ-বিদায়ে'র জন্য চারিদিকে নানারূপে লাঞ্ছিত হইতেছিলেন, তখন তিনি উহা যে কর্ত্তব্যানুরোধেই লিখিয়াছিলেন, তাহাই সকলকে বুঝাইবার জন্য 'দৈনিক বেঙ্গলী' পত্রিকায় একখানি ইংরাজি পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই পত্রের শেষাংশটি এইরূপ—

My object was to expose the inherent immorality of these songs, and if I succeeded in creating disgust in the minds of the audience my object was gained.

(এই সকল গানের অন্তর্নিহিত দুর্নীতি বাহির করিয়া দেখানোই আমার উদ্দেশ্য ছিল, এবং যদি আমি রঙ্গালয়ের দর্শকগণের মনে বিরক্তি উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়া থাকি তাহা হইলেই আমার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে)।

কোন কোন বাঙ্গালা সংবাদপত্রেও তিনি এই মর্ম্মে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার দৃঢ়-চরিত্রের অনুরূপ। নিন্দনীয়

মনে করিলে তিনি এরূপ কাজ কখনও করিতেন না। 'আনন্দ-বিদায়ের' ভূমিকাতেও তিনি এই কথা বলিয়াছেন। আর তিনি যদি সত্যই অনুতপ্ত হইতেন, তাহা হইলে 'আনন্দ-বিদায়ে'র প্রচার বন্ধ করিয়া দিতেন। কিন্তু তাহাও তিনি করেন নাই। আর দেবকুমার বাবুর একথাও বোধহয় সত্য নহে যে, রবিভক্তগণ "অশ্রান্ত বেগে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ অন্যায় আক্রমণ করিলে" তিনি অবশেষে উত্যক্ত হইয়া 'আনন্দ বিদায়' লিখিয়াছিলেন। কারণ, বাঙ্গলা সংবাদ পত্রের পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে আনন্দবিদায়ের অধিকাংশ গান উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইবার বহু পূর্ব্বে ১৩১৩ কিংবা ১৩১৪ সালের 'বঙ্গবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং দ্বিজেন্দ্রলাল যে রীতিমত ভাবিয়া চিন্তিয়া এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহার অনেক প্রমাণ রহিয়াছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে আজ বেশী কিছু লেখা নিষ্প্রয়োজন।

যাঁহারা দ্বিজেন্দ্রলালের জীবন ও কাব্যের সহিত কিঞ্চিন্মাত্রও পরিচিত, তাঁহারা জানেন যে একদিকে তিনি যেমন চরিত্রের দৃঢ়তায়, মনের স্বাধীনতায়, হৃদয়ের উচ্চতায়, যথার্থ পৌরুষ-সমন্বিত নির্ভীক, তেজস্বী পুরুষ ছিলেন, অপরদিকে তেমনই তাঁহার অগাধ স্বদেশপ্রেম এই সকল মহৎগুণের সহিত সম্মিলিত হইয়া তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যকে মহনীয় ও উন্নতির সোপান-স্বরূপ করিয়া তুলিয়াছে। তিনি বায়রণের ভক্ত ছিলেন, এবং এই ইংরাজ কবির উদ্দেশে তিনি যে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন তাহার কয়েক পংক্তিতে (ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া) তাঁহার স্মৃতির বন্দনা করিয়া আজ এই আলোচনার উপসংহার করি :—

তোমার 'হৃদয়'-রাজ্য, সমুদ্রের মত।—তুমি
কভু উপহাস
করিয়াছ, কভু ব্যঙ্গ, কভু ঘৃণা, ফেলিয়াছ
বিষাদ-নিশ্বাস,

গম্ভীর গর্জ্জন কভু,
কভু তিরস্কার;
আগ্নেয় গিরির মত দ্রবীভূত জ্বালা কভু
করেছ উদ্‌গার,
কভু প্রকৃতির উপাসনা যোড়করে, ক্ষুদ্র
বালকের প্রায়,
'আপন' দেশের জন্য জ্বলিয়াছ 'সদা' তীব্র
মর্ম্মবেদনায়।

———

দেবেন্দ্রনাথ সেন

রবীন্দ্রনাথের যুগে তাঁহার সামসময়িক যে কয়জন প্রতিভাশালী কবি ও সাহিত্যিক তাঁহার প্রভাব এড়াইয়া বঙ্গসাহিত্যে অসামান্য প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁহাদেরই অন্যতম। দ্বিজেন্দ্রলাল, অক্ষয়কুমার, ক্ষীরোদপ্রসাদ ও অমৃতলাল রবীন্দ্রনাথের আওতায় পড়িয়া আপনাদের স্বাতন্ত্র্য হারান নাই। ফলে আমাদের কাব্য ও নাট্যসাহিত্য ইঁহাদের অমূল্য দানে অপূর্ব্ব শোভায়, সম্পদে ও বৈচিত্র্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ ইঁহাদের আসরে গান গাহিয়াছেন। সে গানের সুর,—ভাব ও চিন্তার খুব উঁচু পর্দ্দায় না পৌঁছিলেও তাহা যেমন মিষ্ট, তেমনই পবিত্র।

দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা বয়সে দুই কি তিন বৎসরের বড় ছিলেন। উভয়ের মধ্যে বিশেষ প্রীতি ও সৌহার্দ্দ্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'সোনার তরী' দেবেন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ করেন। দেবেন্দ্রনাথও তাঁহার 'গোলাপগুচ্ছ' রবীন্দ্রনাথকে ও তাঁহার 'অশোকগুচ্ছ' শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীকে উৎসর্গ করেন। এই 'অশোকগুচ্ছ' লইয়াই আমরা তাঁহার কাব্যসমালোচনা আরম্ভ করিব।

কবির যৌবনে রচিত শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহাই তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ, দেবেন্দ্র-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই পুস্তকখানিই তাঁহাকে বঙ্গসাহিত্যে অমর করিয়া রাখিবে। কবি গিরীন্দ্রমোহিনী যখন এই বইখানির নাম 'অশোকগুচ্ছ' রাখিলেন, তখন কবি একটি মনোমত নাম পাইয়া পুলকিত হইলেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে ভয়ও হইল বুঝি বা এ নাম সার্থক হইবে না। এই ভাবটি অশোকগুচ্ছের প্রথম কবিতাতেই ব্যক্ত হইয়াছে।

অশোকের গুচ্ছ? কই মা, ইহাতে কোথা
নব বসন্তের কচি চিক্কণ পল্লব?
রতির সীমন্ত-শোভী সিন্দুরের মত
আকাশপুরের কই পদ্মরাগছটা।
নবোঢ়ার ব্রীড়া-দীপ্ত আরক্ত কপোলে
হাসি সম, কোথায় মা, আনন্দের রাশি?
পবিত্র বিষাদ কই? যে মাধুরী হেরি,
মুছিবা চোখের জল মলিন অঞ্চলে,
হাসিত মধুর হাসি চিরদুঃখী সীতা।

কিন্তু কবির এইরূপ ভাবনার কোন কারণ ছিল না। একটা বাসন্তী হাওয়ার মধুর হিল্লোল এই গ্রন্থের সর্ব্বত্রই পাঠকের প্রাণ স্পর্শ করিয়া তাহাকে আনন্দ-বিহ্বল করিয়া তোলে। আর বাঙ্গালীর দাম্পত্য জীবনের মাধুর্য্য ও বিষাদ, আনন্দরূপিণী নবোঢ়ার ব্রীড়াদীপ্তি আর বিষাদময়ী বালবিধবার অন্তর-ব্যথা কবি দেবেন্দ্রনাথের নিপুণ তুলিকা-সম্পাতে যেরূপ নানাবর্ণে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে সেরূপটি বুঝি আর কাহারও কাব্যে বড় বেশী দেখিতে পাই না। এই নানাবর্ণের মধ্যে যে রঙটি

প্রাধান্য লাভ করিয়াছে সেটি হইতেছে অশোকের রক্তিমা। সে রক্তিমা কখনও স্বামিসোহাগিনী তরুণীর সীমন্তশোভী সিন্দূরের মত তাহার পবিত্র দাম্পত্যলীলার উচ্ছ্বসিত আনন্দরাশি আমাদের চক্ষের সম্মুখে আনিয়া দেয়, কখনও বা তাহা নবপরিণীতা কিশোরীর কপোলে গণ্ডে বাসরের প্রথমচুম্বন যে লজ্জারুণরেখা আঁকিয়া দেয় তাহারই আভা, মনে হয় যেন তাহা বালসূর্য্যের সমস্ত শোভা লইয়া দম্পতীর জীবন-প্রভাত রাঙ্গিয়া দিতেছে। আবার এই রক্তিমা দেখি কবি-প্রিয়ার 'অলক্তাক্ত চরণে,' যাহার অনবদ্য সৌন্দর্য্যের উপর অলক্তরাগের অত্যাচার দেখিয়া কবি এইরূপে অনুযোগ করিতেছেন :

উদার উষার কাল,
সান্ধ্য মেঘ রক্তলাল
রঞ্জিল গগনাঙ্গন। বল, রঙ্গ আলি,
বসন্তে সাজালে কেন শারদীর ডালি ?

কবি তাই চুপি চুপি খোকার হাতে জলের ঘটি দিয়া তাহাকে জননীর পায়ের উপর ঢালিয়া দিতে শিখাইয়া দিয়াছেন। এই কারণে কিংবা যখন ঘোমটা খোলার অত্যাচারে

ক্ষুদ্র রোষ জেগে উঠে
রাঙা তোর ওষ্ঠপুটে
আরো রাঙাইয়া দিল, কবি রঙ্গ-কেলি,
কে যেন সিন্দূর দিল লাল পুষ্পে ঢেলি।

তখনও অভিমানিনী নারীর রোষারুণ বদনমণ্ডল কি অশোকগুচ্ছের লোহিত রাগ ধারণ করে না ? দাম্পত্যজীবনের বিবিধ বর্ণবৈচিত্র্যের মধ্যে এই যে লালের খেলা ইহার মধ্যে বেদনার রক্তরাগ আসিয়া মিশিয়াছে।

বঙ্গবিধবার মর্ম্মন্তুদ হৃদয়-ক্ষত হইতে নিরন্তর যে রক্ত নিঃসৃত হইতেছে তাহাও কবি অনাবৃত করিয়া দেখাইতে ভুলেন নাই। তাঁহার অশোকগুচ্ছের লাল রঙ বুঝি বা তাহাতে আরও বেশী গাঢ়তর হইয়াছে।

কিন্তু কবির মন ইহাতেও তৃপ্তিলাভ করে কই? অশোক নিজে এত লাল কেন সে সমস্যার ত সমাধান হইল না! 'চেতনাচেতনে প্রকৃতিরূপণ' কবি প্রকৃতির দুলাল অশোক-তরুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন:

হে অশোক, কোন্ রাঙ্গা চরণ চুম্বনে
মর্ম্মে মর্ম্মে শিহরিয়া হ'লি লালে লাল?
কোন্ দোলপূর্ণিমায় নব বৃন্দাবনে
সহর্ষে মাখিলি ফাগ প্রকৃতি-দুলাল?
কোন্ চিরসধবার ব্রত উদ্‌যাপনে
পাইলি বাসন্তী শাড়ী সিন্দূরবরণ?
কোন্ বিবাহের রাত্রে বাসর-ভবনে
এক রাশি ব্রীড়া হাসি করিলি চয়ন।
বৃথা চেষ্টা—হায়। এই অবনী মাঝারে
কেহ নহে জাতিস্মর—তরু জীব প্রাণী।
পরাণে লাগিয়া ধাঁধা আলোক আঁধারে
তরুও গিয়াছে ভুলে অশোক-কাহিনী।
শৈশবের আবছায়ে শিশুর দেয়ালা;—
তেমতি অশোক তোর লালে লাল খেলা।

কিন্তু কবি-চিত্ত ইহাতেও সন্তোষলাভ করিল না। অশোকের ত প্রকৃত পরিচয় তিনি পাইলেন না। আবার তিনি আরএকটি সনেটের মধ্যে

উপমা-ভরা প্রশ্নের পর প্রশ্ন সাজাইয়া অশোকের জন্ম-ইতিহাস আবিষ্কার করিয়া ফেলিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

কোথায় সিন্দুর গাঢ়—সধবার ধন ?
আবির, কুঙ্কুম কোথা, গোপিনী-বাঞ্ছিত ?
কোথায় মুরারির কণ্ঠ আরক্ত বরণ ?
কোথায় সন্ধ্যার মেঘ লোহিতে রঞ্জিত ?
কোথায় বা ভাঙ্গে রাঙ্গা রুদ্রের লোচন ?'
কোথা গিরিরাজ পদ অলক্ত-মণ্ডিত ?
মদন বধুর কোথা অধরের-কোণ,
ব্রীড়ার বিক্ষেপে মরি সতত লোহিত ?
সকলেরি কিছু কিছু চারুতা আহরি',
ধরি রাগ অপরূপ গাঢ় ও তরল,
গুচ্ছে গুচ্ছে তরুবরে করিয়ে উজ্জ্বল
রাজিছে অশোক ফুল, মরি কি মাধুরী।

উপরে যে কয়টি ছত্র উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা হইতেই দেবেন্দ্রনাথের ভাষা ও ছন্দের লালিত্য এবং চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে। তাঁহার ভাব, ভাষা ও ছন্দ সর্ব্বত্র সুমধুর ও স্বচ্ছন্দগতি ; একটিমাত্র ভাবের ব্যঞ্জনায় চিত্রের পর চিত্র, উপমার উপর উপমা দিতে তিনি বোধ হয় অদ্বিতীয়। ভাষার মধ্যে কোথাও ধোঁয়াটে বা আবছায়া ভাব নাই, এবং এই ভাষার মাধুর্য্য ও ছন্দের সলীল প্রবাহ সর্ব্বত্র অপ্রতিহত। কবি যেন সৌন্দর্য্যের পসরা খুলিয়া বসেন। সেথায় 'কোহিনুরে কোহিনুরে আলো যে উথলি পড়ে, ছড়াছড়ি ইন্দ্রনীলে হীরায়

মৃত্যুর।' আরও দুএকটি উদাহরণ দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। একটি সনেটে কবি 'যুবতীর হাসি' এইরূপে বর্ণনা করিতেছেন :—

হে রূপসী, নিশি শেষে কোন্ নদীধারে,
কোন্ স্বপ্নময় পুরে, কোন কামাখ্যায়,
চরণে নূপুর যেন, অনন্ত ঝাঝারে,
বহিয়া সে কুলুধ্বনি আইলে হেথায় ?
নাগেশ্বর চাঁপাতলে কোন্ অলকায়
দাঁড়াইয়া ছিলে তুমি, মদনমোহিনী ?
এক রাশি জাতি যুথী মল্লিকা কামিনী
কাঁপাইয়া কোলে তব পশিল হিয়ায়।
গান নাহি বোঝা যায়, ভাসে শুধু সুর ;
ফুল নাহি দেখা যায়, সৌরভ কেবলি ;
প্রাণের গবাক্ষ দিয়া জ্যোৎস্না সুমধুর
উছলিয়া অধরেতে পড়ে আসি ঢলি।
সে কাহিনী তুমি আমি গেছি এবে ভুলি।
এ কি হাসি। এ যে শুধু আকুলি ব্যাকুলি।

আবার উচ্চ হাসি কবির প্রাণে কিরূপ ভাবের লহরী তুলিয়াছে তাহারও একটু পরিচয় দেওয়া দরকার :

মূর্ত্তিমতী রাগিণীর ভুজমেখলায়
বাজি যেন উঠিয়াছে করুণ কিঙ্কিণী,
হৃদয়ের কুঞ্জে কুঞ্জে বাসন্তী উষায়
জাগি যেন উঠিয়াছে নূপুর শিঞ্জিনী।

'ডায়মণ্ড-কাটা মল', 'আলতা মোছা', 'ঘোমটা খোলা' খোঁপা খোলা' প্রভৃতি অনেক কবিতায় কবি তাঁহার এই চিত্রাঙ্কনী শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। মলের রেওয়াজ অনেক দিন হইল উঠিয়া গিয়াছে; আলতাও অদৃশ্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে, কিংবা হয়ত পাদুকা-শোভিত চরণকমলে এখন আর তাহার স্থান নাই; ঘোমটা বা খোঁপা খুলিয়া এখন আর নববধূর লাজ ভাঙ্গাইতে হয় না, ঘোমটা এখন সীমন্তের শেষ প্রান্তে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কোনরূপে টিঁকিয়া আছে, তাহাও বুঝি আর বেশী দিন থাকে না। আর বাঙ্গালীর মেয়ের বড় আদরের খোঁপাও এখন অনাদৃত, বুঝি তাহারও দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু সেজন্য আক্ষেপ করাও বৃথা। কালের প্রভাবে অনেক বস্তুই ভাসিয়া যায়। সে সব বস্তু যদি কাব্যের উপাদান রূপে কোন কবি গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহা হইলেও আমাদের কাব্যরস উপভোগের পক্ষে কোনই হানি হয় না, যদি সেই কবির রসসৃষ্টি খুব উচ্চশ্রেণীর হয়। বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের চেহারাটা যদিও কালক্রমে বদ্‌লাইয়া যায় তাহা হইলেও দেবেন্দ্রনাথের কাব্যসৌন্দর্য্য ম্লান হইবে না। আমাদের সাহিত্যভাণ্ডারে তাঁহার কবিতাগুলি চির সম্পৎ-স্বরূপ বিরাজ করিবে।

করুণ রস ফুটাইতেও দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন সিদ্ধহস্ত। বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে বিধবা নারীরূপে যে বিষাদ-প্রতিমা ও মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণুতা আমাদের জীবনকে বেদনাতুর করিয়া রাখিয়াছে কবি তাহাদর কথা বিস্মৃত হন নাই। পূর্ব্বে ইহার একবার উল্লেখও করিয়াছি। এখানে যেমন এক-দিকে দাম্পত্যলীলার উচ্ছল হাসিরাশি আছে, অপর দিকে তেমনিই আবার যুবতী বিধবার তপ্ত অশ্রুও তাহারই অন্তরালে নিরন্তর ঝরিতেছে।

ইহার জন্য কবির প্রাণ কাঁদিয়াছে এবং তিনি তাঁহার মোহিনী তুলিকার স্পর্শে কয়েকটি কবিতায় বঙ্গবিধবার যে অনুপম চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা যেমন করুণ তেমনই সুন্দর। স্বামিবিয়োগবিধুরা নারী যখন বিলাপ করিতেছে—

সকলি ত হইল স্বপন।
তোমার সহিত নাথ, ইহ জনমের সাধ
চিতায় করিল আরোহণ।
অভাগীর রূপ নাও সিন্দূরের কৌটা নাও
নাও নাও বসন ভূষণ;
অন্ধকার একরাশ নিবিড় এ কেশপাশ
করিত যা চরণ চুম্বন।

তখন এই কাতরোক্তি শুনিয়া আমাদের নয়ন বাষ্পাকুল হইয়া উঠে। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মধ্যে যে অসীম প্রেম, ধৈর্য্য ও আত্মসমর্পণের ভাব দেখি তাহা কি হৃদয়স্পর্শী!—

দাও দাও স্মৃতিটি তোমার,
ওই স্মৃতি বুকে ক'রে সারাদিন সারাক্ষণ
করিব ও মুরতি স্মরণ।
হে নাথ! কিছু না চাই, এই ভিক্ষা তব ঠাঁই
দাও দাও অন্নভোগী তোমার জীবন।

এই দেবীতুল্যা বিধবার উপর হিন্দু সমাজের নিষ্ঠুরতা তিনি 'রাধারাণী' শীর্ষক কবিতায় দেখাইয়াছেন।

কিন্তু কবির এই করুণাধারা শুধু যে বিধবারই উপর বর্ষিত হইয়া নিঃশেষ হইয়াছে তাহা নয়। হিন্দু সমাজ নারীজাতির উপর যে অত্যাচার

করিয়া আসিয়াছে বা এখনও করিতেছে তাহা হৃদয়বান্ কবির হৃদয় বিগলিত না করিয়া থাকিতে পারে না। কৌলীন্য ও পণপ্রথার যুপ-কাষ্ঠে হিন্দু সমাজে যে নারী বলি হইয়া থাকে দেবেন্দ্রনাথ তাহার যথার্থ চিত্র দিয়াছেন। কুলীন-যুবতী সুদীর্ঘকাল স্বামিদর্শনাকাঙ্ক্ষায় অতিবাহিত করিয়া শেষে যখন একদিন তাহার সেই চির-অভীপ্সিত বস্তুটিকে পাইল তখন তাহার তস্করবৎ নৃশংস ব্যবহারে কিরূপে সে

> ঘৃণায় ও রোষে
> ভালের সিন্দুর বিন্দু ফেলিল মুছিয়া।

এবং পরে সে কিরূপে ধীরে ধীরে বিপথে পদার্পণ করিল তাহা 'কলঙ্কিনীর আত্মকাহিনী'তে উজ্জ্বল ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। কৌলীন্যের যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে। এরূপ চিত্র বোধ হয় আর কোন কবিকে অঙ্কিত করিতে হইবে না। কিন্তু পণপ্রথার শাণিত খড়্গ এখনও বঙ্গবালার মস্তকোপরি উদ্যত রহিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ কখনও শ্লেষবর্ষণ দ্বারা, কখনও বা করুণ রসের উৎস ছুটাইয়া এই প্রথার জঘন্যতা প্রকটিত করিয়াছেন। কবি বিংশ শতাব্দীর বরকে দশহাজার টাকার ভি পি পার্শেলে বিবাহসভায় পাঠাইয়াছেন। আবার অন্যত্র দেখি কন্যার পিতা প্রতিশ্রুত দশ সহস্র মুদ্রা দিতে না পারায় 'বাকি পাঁচশত রূপেয়া'র জন্য শ্বশুরগৃহে বন্দিনী কন্যা মনের দুঃখে তিলে তিলে পুড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল!

> অকাল হেমন্ত আসি লয়ে পাণ্ডু হিম রাশি
> তুষারে ডুবায়ে দিল সে কনক-নলিনী।

নারীর প্রতি এই ঘোর অনাদরে হিন্দু সমাজ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। কবি তাই তাঁহার 'দুহিতামঙ্গলশঙ্খ' বাজাইয়া বলিতেছেন—

নাহি ঘৃণা, নাহি লজ্জা! ধিক! ধিক! অধম বাঙ্গালী
তোমাদের বিদ্যাবুদ্ধি ভস্মে ঘৃত! কি অন্ধ নয়ন।
পুত্র হ'লে শাঁখ বাজে, কন্যা হ'লে আঁধার ভবন।
নারীরে অবজ্ঞা করি মাখিয়াছ মুখে চুণকালি।

* * * *

মাতা নারী, ধাত্রী নারী, ভয়হরা দেবতারূপিণী,
নারীই শৃঙ্খলা বিশ্বে, মিষ্টরস, সৌন্দর্য্য আধার।
নারীর মাহাত্ম্য মূঢ়, বুঝিলে না, তাই হাহাকার
আজি বঙ্গে গৃহে গৃহে।

তিনি যে হাস্যরসের অবতারণা করিতেও বিলক্ষণ পটু ছিলেন তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ তাঁহার 'দগ্ধকচু' নামে সরস গদ্য গ্রন্থখানি। শ্বশুরালয়ে শ্যালিকারা মিলিয়া কবিকে দগ্ধ কচু খাওয়াইয়া কিরূপে লাঞ্ছিত করিয়াছিল এবং অতঃপর তিনি নিজে তাহার কিরূপ প্রতিশোধ লইয়াছিলেন, তাহাই এই গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়। ইহার ছত্রে ছত্রে হাসির ফোয়ারা ছুটিয়াছে। তাঁহার কবিতার মধ্যেও হাস্যরসের অভাব নাই। 'কোন বিশ্বনিন্দুক সমালোচকের প্রতি' শীর্ষক ব্যঙ্গ কবিতা হইতে কয়েক ছত্র এখানে তুলিয়া দিতেছি :

পূর্ব্বজন্মে ছিলে তুমি শোণিত-শোষক
কোরিয়ার জোঁক বুঝি, হে সমালোচক?

পায়স পান সে বড়, অমৃত ও টক্ ।—
মানুষের রক্তবিন্দু মরি কি রোচক।
আঁকা বাঁকা গতি তব কথাগুলি বক্র ;
এক রত্তি বিষ নাই, কুলোপানা চক্র।
রসনা-ধনুকে তীক্ষ্ণ বচনের তীর ;
ঢাল নাহি, খাঁড়া নাহি, তবু মহাবীর।
তুবড়ি ছুঁড়িয়া ভাবো দাগিয়াছ তোপ ;
বজ্রধর। থাম থাম ;—বোঝা গেছে কোপ।
পরচুলে হে সুন্দর, ঢাকিয়াছ টাক ;
ঝুটো চুনি, ঝুটো পান্না—তারি এত জাঁক ?

এ পর্য্যন্ত আমরা 'অশোকগুচ্ছ' লইয়াই প্রধানতঃ আলোচনা করিয়াছি। এইবার দেবেন্দ্রনাথের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলি সম্বন্ধে কিছু না বলিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ১৩১৯ সালে শারদীয়া পূজার পূর্ব্বে তিনি একসঙ্গে 'গোলাপগুচ্ছ', 'শেফালিগুচ্ছ', 'পারিজাতগুচ্ছ', 'অপূর্ব্ব নৈবেদ্য,' 'অপূর্ব্ব শিশুমঙ্গল' ও 'অপূর্ব্ব বীরাঙ্গনা' এই ছয়খানি নূতন কবিতা-পুস্তক ও অশোকগুচ্ছের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। তাঁহার স্থাপিত শ্রীকৃষ্ণপাঠশালা হইতে এই সময়ে যথেষ্ট অর্থাগম হইতে থাকে। সেই অর্থে তাঁহার এই সমগ্র গ্রন্থপ্রকাশ সহজেই সুসম্পন্ন হইয়াছিল। বিভিন্ন মাসিকপত্রে বহুকাল ধরিয়া যে সকল অসংখ্য কবিতা ছড়াইয়া রহিয়াছিল, সেইগুলি সংগ্রহ করিয়া তিনি এই কয়খানি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন।

এই কবিতারাশির সর্ব্বত্র দেবেন্দ্রনাথের প্রতিভার দীপ্তি জাজ্বল্যমান ; কিন্তু তথাপি আমাদের মনে হয়, 'অশোকগুচ্ছে'র

শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কবিতা এই গ্রন্থগুলির মধ্যে বড় বেশী নাই। সেই দাম্পত্য লীলার চিত্র, সেই কুপ্রথাপীড়িতা হিন্দুনারীর দুঃখকাহিনী, সেই নিছক সৌন্দর্য্যসৃষ্টির অশ্রান্ত প্রয়াস—এ সমস্তই আছে; কিন্তু তথাপি যেন পাঠকের মন তৃপ্তির রসে ভরিয়া উঠে না।

কোন কোন কবিতা ভাবে, ভাষায় ও ভঙ্গীতে মধুসূদন ও হেমচন্দ্রকে স্মরণ করাইয়া দেয়। দেবেন্দ্রনাথ বলিতেন যে, এই দুই জনকেই তিনি তাঁহার কাব্যগুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার 'অপূর্ব্ব বীরাঙ্গনা কাব্যে'র প্রারম্ভে তিনি মাইকেলের উদ্দেশে বলিতেছেন—

হে গুরু, কখনও তোমা দেখিনি নয়নে,
কিন্তু দেব! দ্রোণ-শিষ্য একলব্য সম
মানসে গড়িয়া তব মূর্ত্তি নিরুপম
শিখিয়াছি ধনুর্বিদ্যা তোমারি সদনে।

কিন্তু এই গুরু-শিষ্য সম্পর্ক মানিয়া লওয়া কঠিন। কারণ, হেমচন্দ্রের পৌরুষ ও রৌদ্ররস কিংবা মাইকেলের জলদনির্ঘোষ দেবেন্দ্রনাথে কুত্রাপি নাই। তাঁহার বৃহত্তর রচনাগুলি প্রায়ই ব্যর্থ হইয়াছে। পক্ষান্তরে দেবেন্দ্রনাথের যাহা বৈশিষ্ট্য—তাঁহার মাধুর্য্য, লালিত্য ও চিত্রপ্রাচুর্য্য—হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী'র মধ্যে খুব বেশী পাওয়া যায় বলিয়া মনে করি না। অবশ্য মাইকেলের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' বাঙ্গালার গীতিকাব্য-সাহিত্যে অতুলনীয়। সুতরাং আধুনিক যুগের কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বা কবি কালিদাস রায় বিশেষরূপে রবি-ভক্ত হইলেও যেমন রবীন্দ্রনাথের অনুকারী বা তাঁহার কাব্য-শিষ্য নহেন, তেমনই দেবেন্দ্রনাথও নিজেকে মধুসূদনের

সাক্রেদ বলিয়া প্রচার করিলেও তাঁহার কাব্যে তাহার বিশেষ প্রমাণ নাই। একস্থলে তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন, 'আমার এ রবিতপ্ত কল্পনাকুমুদী ফুটিবে কি পুনর্ব্বার?' তাঁহার এই উক্তি রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি ব্যতীত আর কিছুই নহে। কারণ, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন বলিয়া ত আমরা মনে করি না।

সে যাহা হউক, আমরা এখন তাঁহার শেষ কয়খানি পুস্তকের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দিয়া প্রবন্ধ শেষ করি। 'অশোক-গুচ্ছের' পরই 'গোলাপ-গুচ্ছে'র স্থান। ইহার প্রথম কবিতা—

এবে গোলাপে গোলাপে ছাইয়ে ফেলেছে
এ মধু কানন দেশ—

অনবদ্য। কবি যে ইহার পরেই অন্য একটি কবিতায় বলিতেছেন—

চিরদিন চিরদিন রূপের পূজারী আমি
রূপের পূজারী—

তাহার যথেষ্ট প্রমাণ কবি এই গ্রন্থেও দিয়াছেন। তাঁহার 'প্রাণ-বাতায়নে ভাবগুলি সব গোলাপি নেশায় চুর।' নারীর দেহে, দম্পতীর প্রেমলীলায় ও শিশুর হৃদয়-রাজ্যে একই সৌন্দর্য্যের বিভিন্ন বিকাশ দেখিয়া কবি আত্মহারা। তাই কখনও তিনি 'মধুর জ্যোৎস্না'-রূপিণী শ্যামাঙ্গী সুন্দরীকে 'আধ আলো আধ ছায়া বনরাজি গাঢ়' বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। আবার কখনও বা বালার্ককিরণসন্নিভা গৌরাঙ্গীর

'রূপরৌদ্রে দু'নয়নে ধাঁধাঁ লেগে যায়।' যখন 'আগ্রহে দম্পতী করে প্রথম চুম্বন' তখন সেই মুগ্ধ বিহ্বল নব-দম্পতীর ন্যায় কবির হৃদয়েও—

> কুহরিয়া উঠে পিক, শিহরিয়া উঠে দিক
> ভ'রে যায় ফলে ফুলে শ্যামল যৌবন

আর তিনি ভাবিয়া আকুল—

> কি জানি কি নিধি দিয়া গড়িল চতুর বিধি
> প্রথম চুম্বন।

আবার সদ্যঃপত্নীবিয়োগব্যথিতের 'শেষ চুম্বন' কামনা—

> দাও দাও বিদায়-চুম্বন।
> জীবনের রত্নাগারে একেবারে করি খালি
> অভাগারে ফাঁকি দিযে মরণে দিতেছ ডালি।
> ল'য়ে ও হীরার কুচি চক্ষের সলিল মুছি
> দরিদ্র করিবে সখি, জীবন যাপন।

'অশোক-গুচ্ছের' বিধবার বিলাপস্মৃতি আনিয়া দেয়। এই কারুণ্যধারা 'বিরাগীর আক্ষেপ,' 'উন্মাদিনীর কাহিনী' প্রভৃতি কবিতারও ছত্রে ছত্রে প্রবাহিত হইয়াছে। 'বাকি পাঁচশ রূপেয়া'র উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি। এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'কদম্বসুন্দরী' নামক সুদীর্ঘ কবিতাটি নির্দ্দোষ না হইলেও নানা রসের সমাবেশে বেশ উপভোগ্য।

'অপূর্ব্ব নৈবেদ্য' ও 'অপূর্ব্ব শিশুমঙ্গল' ব্যক্তিগত কবিতার সমষ্টি, প্রথম খানি কবির বন্ধু-বান্ধব এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, কবি করুণানিধান, কবি সত্যেন্দ্র নাথ, কবি কালিদাস রায় ইত্যাদি তাঁহার পরিচিত কবি ও সাহিত্যিকদের স্তুতিবাদে পূর্ণ, এবং অপর খানিতে কবি শিশুদের সম্বন্ধে লিখিত নানা কবিতার মালা গ্রথিত করিয়াছেন।

এই গ্রন্থগুলি 'অপূর্ব্ব' কেন, তাহার উত্তরে কবি স্বলিখিত ভূমিকায় বলিয়াছেন, 'এই কাব্যগুলির অধিকাংশ কবিতাই শ্রীভগবানের উদ্দেশে বিরচিত হইয়াছে।'

এ সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ একদিন আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি। তিনি বলিয়াছিলেন,—

'আমি যে সকল মহিলা কি বালিকার স্তুতিবাদ করিয়াছি, তাঁহারাই আমার কবিতার মুখ্য বিষয় নহেন। আমি তাঁহাদের অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন দিক হইতে একটা Ideal womanhood—নারীত্বের পূর্ণ আদর্শ অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সেইজন্য এই সকল কবিতাতেও প্রায়ই আধ্যাত্মিকতা আসিয়া পড়িয়াছে; কারণ, নারীজাতিকে আমি জগন্মাতার অংশরূপিণী, ভাগবতী শক্তির অভিব্যক্তি ব্যতীত আর কিছু মনে করিতে পারি না। আমার শিশুসম্বন্ধীয় কবিতাগুলিও এই অর্থে বক্তিগত হইয়াও সার্ব্বজনীন। এখানেও আমি শিশু-চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া বিভিন্নভাবে সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যের আভাস দিতে প্রয়াস পাইয়াছি। একটা আদর্শ শিশুজীবন যাহার প্রকাশ ভিন্ন হইলেও মূলতঃ এক, ইহাই আমার শিশু-কবিতাগুলির বিষয়।'

সুতরাং এই 'অপূর্ব্ব' কবিতাগুলি কোন্ অর্থে 'শ্রীভগবানের উদ্দেশে

রচিত' তাহা কবির এই উক্তি হইতে বোঝা যায়। 'জগাই ডাকাত' নামক ক বিতার শেষ ভাগে তিনি ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। জগাই অর্থাৎ জগন্নাথ একটি তিন বছরের শিশু। এই শিশুতে তিনি জগন্নাথকেই মূর্ত্তিমান রূপে দেখিতেছেন :

অমৃতের মহাসিন্ধু অপূর্ব্ব হিল্লোলে
আমার এ কবি-চিত্তে বহিছে কল্লোলে।
তারি বেলাভূমে আমি রচেছি সুন্দর
সৌন্দর্য্যের জগন্নাথপুরী মনোহর।
সুন্দর দেউল রচি করেছি স্থাপন
রে সুন্দর, তোর ওই মূরতি মোহন।
প্রসারি অন্তরদৃষ্টি হের এ অমর সৃষ্টি
এ নহে কল্পনা-কথা, এ নহে স্বপন ;
শিশুই মানববেশে দেব নারায়ণ।

এই আধ্যাত্মিকতা শেষ বয়সে তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল, এবং অনেক স্থলে ইহা যে তাঁহার সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির অন্তরায় হইয়াছিল তাহা আমাদিগকে দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে। তাই দেখি যখন তিনি সর্ব্বগ্রাসিনী আধ্যাত্মিকতার হাত এড়াইয়াছেন তখন তাঁহার কবিতাও খুব সুন্দর হইয়াছে। দু' একটা উদাহরণ দিই। তাঁহার শিশুকন্যা জন্মের পূর্ব্বে সে কি ছিল এবং কোথায় ছিল কবি সে সম্বন্ধে তাহাকে এইরূপে প্রশ্ন করিতেছেন :

এত দিন কোথা ছিল পাগলিনী মেয়ে ?
সুধাংশু মণ্ডলে তুই ছিলি কি আনন্দময়ী,
চকোরেরা উড়ে যথা সুধাকর ছেয়ে ?

জ্যোৎস্না কিরণ-মাথে তুইও তাদের সাথে
খেলাতে মগন ছিলি গান গেয়ে গেয়ে ?
অপ্সরার কণ্ঠে যথা আরক্ত অপরাজিতা
পারিজাত লতাগুলি উঠে বেয়ে বেয়ে,
তুইও ইন্দ্রাণী গলে হেলে দুলে কুতুহলে
ছিলি লগ্ন, মগ্ন দেবী তোর স্পর্শ পেয়ে।
এত দিন কোথা ছিলি পাগলিনী মেয়ে ?

ইহার সহিত রবীন্দ্রনাথের 'খোকার জন্ম' তুলনা করা যাইতে পারে। দেবেন্দ্রনাথের কবিতা নিছক সৌন্দর্য্যের প্রস্রবণ, আর রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সৌন্দর্য্যের সহিত সত্যের অপূর্ব্ব সমন্বয়।

আর একটি ছোট মেয়েকে দেখিয়া কবির দশভুজা প্রতিমা মনে পড়িয়াছে বটে, কিন্তু তাহা শুধু তাহার রূপের জন্য।

দেখ্ রে দেখ্ চেয়ে মোহিনী রাঙা মেয়ে,
ভুবন-আলো-করা মোহন রূপ।
আয় রে করি পূজা এসেছে দশভুজা—
বাজারে শাঁখ তোরা জ্বালা রে ধূপ।
যেন রে মুখ দিয়া অমিয়া উথলিয়া—
পড়িছে মার মোর। এ কি রে রূপ!
জোছনা পড়ে খসি, হের রে মুখশশী।
আলোকে ভরি গেল মানস-কূপ।
কোথা সে সারি সারি গোকুলে গোপনারী'
কাঁকণ ভুজে বাজে, চরণে মল,—
গলেতে বনমালা, (যেন রে বনবালা)
চুলেতে থাকে থাকে বকুল দল,—
তাদেরও জারি জুরি তাদেরও ভারিভুরি
মোর মায়ের কাছে কেবলি ছল।

প্রকৃত আধ্যাত্মিক ভাবের সঙ্গে এই সব কবিতার বিশেষ সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয় না। 'শিশুমঙ্গলে' এইরূপ সুন্দর কবিতার অভাব নাই।

বাঙ্গালার গীতি-কবিদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের স্থান যে খুব উচ্চে তাহাই আমি এই প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। বাঙ্গালীর ভাবপ্রবণ ও সৌন্দর্য্য-পিপাসু প্রাণ চিরকাল গীতি-কবিতার কোমলকান্ত সঙ্গীতে আপনাকে শতধারে উচ্ছ্বসিত করিয়া আমাদের জাতীয় সাহিত্যকে এক অসামান্য বিশেষত্ব দান করিয়াছে।

সেই সঙ্গীতের সুর কখনও বা নরনারীর প্রেমলীলার শাশ্বত রহস্য ও অনন্ত মাধুর্য্য ব্যক্ত করিয়াছে, কখনও বাঙ্গালীর নিজস্ব দাম্পত্য জীবনের অন্তর্নিহিত সুখ-দুঃখের সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে আরও বেশী সুন্দর, আরও বেশী উজ্জ্বল ও বৈচিত্র্যময় করিয়া তুলিয়াছে। এই শেষোক্ত সুরই দেবেন্দ্রনাথের কাব্যে ধ্বনিত হইতেছে। তাহাতে রবীন্দ্রনাথের মনস্বিতা বা হেমচন্দ্রের তেজস্বিতা না থাকিতে পারে, তাহাতে হয়ত দেশহিতৈষণার উন্মাদনা নাই বা বিশ্বরহস্যের নিগূঢ় সঙ্গীতও শুনিতে পাই না; কিন্তু তাহা হইলেও এই সুর বাঙ্গালীমাত্রেরই প্রাণস্পর্শ করে। কারণ, তাহার প্রাণের তারে নিরন্তর যাহা ঝঙ্কৃত হইতেছে, তাহারই এক সঙ্গীতময় প্রতিধ্বনি সে তাহাতে শুনিতে পায়, তাহারই গার্হস্থ্য-জীবনের সৌন্দর্য্যময় চিত্র তাহার চক্ষের সম্মুখে সে দেখিতে পায় সে গানে ও চিত্রে অস্বাস্থ্যকর বৈদেশিক প্রভাবের লেশমাত্র নাই, অসংযমের কলুষ কোথাও তাহার পবিত্রতা নষ্ট করে নাই। তাহা স্বচ্ছ, নির্ম্মল ও পূত স্রোতস্বিনীর ন্যায় তরতর বেগে বহিয়া চলিয়াছে। বঙ্গবাসী তাহা আকণ্ঠ পান করিয়া ধন্য হউক।

সাহিত্যে মৌলিকতা

মৌলিকতা যে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের একটা প্রধান গুণ তাহা সর্ব্বজন-স্বীকৃত। কিন্তু সাহিত্যের প্রকারভেদ অনুসারে এই শব্দটির অর্থও পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে, একথা ভুলিলেও চলিবে না। সাধারণভাবে অভিনব বস্তু সৃষ্টি করিবার ক্ষমতাকে মৌলিকতা নামে সংজ্ঞিত করা যাইতে পারে, কিন্তু সাহিত্য-বিশেষে এই 'বস্তু'টি আখ্যান-বস্তু কিংবা ভাব-বস্তু হইতে পারে। কাব্য ও নাটকে আমরা যে মৌলিকতার সন্ধান করি তাহা বিষয়গত নহে ভাবগত, অর্থাৎ আখ্যান-বস্তু অভিনব না হইলেও মৌলিকতার হানি হয় না, যদি ভাব, রস ও সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি অক্ষুণ্ণ থাকে।

কালিদাস, সেক্সপীয়র প্রভৃতি মহাকবিদের কাব্যনাটকে দেখিতে পাই যে, তাঁহারা রস-সৃষ্টির উপাদানের জন্য প্রায়ই পূর্ব্ব সূরিগণের নিকট ঋণী। সুতরাং তাঁহাদের মৌলিকতা বিষয়ের মধ্যে নিবদ্ধ নহে, এমন কি বিষয়গত সৃষ্টিকে তাঁহারা তুচ্ছ বা অনাবশ্যক বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু পুরাতন মাল-মসলা লইয়া তাঁহারা যে অফুরন্ত সৌন্দর্য্য ও জীবন্ত চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাই তাঁহাদিগকে অতুলনীয় মৌলিকতা দান করিয়াছে।

গীতিকাব্য সম্বন্ধে উক্ত নিয়মের একটু ব্যতিক্রম বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হইতে পারে। ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক বিষয়ের কথা ছাড়িয়া দিই; কারণ তাহা সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি, যদিও নাটকে ও বর্ণনাত্মক কাব্যে পুরাণেতিহাসের অন্ধ অনুবর্ত্তন মৌলিকতার হানিকর বলিয়া বিবেচিত হইবে; বিশেষতঃ প্রতিভাহীন লেখকের পক্ষে। কিন্তু কোন বিশেষ ঐতিহাসিক, পৌরাণিক বা কিংবদন্তীমূলক কাহিনীকে কবি যখন ভাব ভঙ্গীতে সৌন্দর্য্যময়ী গীতি-কবিতার আকার দান করেন, তখন তাহার মৌলিকতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

আরও একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। গীতি-কবিতা প্রায়ই আখ্যান-বস্তুর অপেক্ষা রাখে না, কারণ তাহা ভাবরসঘন। বৈষ্ণব পদাবলী ও রবীন্দ্রনাথ, শেলী, কীট্‌স্, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রভৃতি কবিশ্রেষ্ঠগণের অসংখ্য কবিতা ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

কোন কোন কাব্য নাটকে বিষয়গত ও ভাবগত মৌলিকতা রক্ষিত হইলেও অনুকরণের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা হইলেও সাহিত্য হিসাবে এই শ্রেণীর রচনা নিকৃষ্ট না হইতে পারে। সেক্সপীয়রের 'রিচার্ড দি সেকেণ্ড', মার্লোর 'এড্‌ওয়ার্ড দি সেকেণ্ড' নামক নাটকের অনুকরণে লিখিত।

আমাদের দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহানের' উপর সেক্সপীয়রের 'কিং লিয়রের' ছায়া বিশেষরূপে পড়িয়াছে। কিন্তু অনু-করণের গন্ধ থাকিলেও 'রিচার্ড দি সেকেণ্ড' একখানি উৎকৃষ্ট নাটক; এবং 'সাজাহানের' মৌলিকতা নষ্ট হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না।

'মেঘনাদবধ' ও 'বৃত্রসংহার' আমাদের ভাষায় দুইখানি আধুনিক

মহাকাব্য এবং এই দুই মহাকাব্য যে বঙ্গ সাহিত্যের মুকুটমণি তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই দুইখানি কাব্যই যে পাশ্চাত্য মহাকাব্যের অনুকরণে রচিত তাহা বঙ্গসাহিত্যের পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন।

রবীন্দ্রনাথের কোন কোন শ্রেষ্ঠ কবিতার ভাব দেশীয় ও বিদেশীয় কবিতার মধ্যে নিহিত দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার 'মদন ভস্মের পর' নামক অনুপম কবিতাটির মূলভাব কবি রাজশেখরের যে সংস্কৃত শ্লোকটি হইতে গৃহীত, তাহা কবি কালিদাস রায় এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—

মীনকেতনে দহিয়া বিধি করেছ একি রঙ্গ,
মমতাহীন পেয়েছ সে যে ভুবনভরা অঙ্গ ;
পঞ্চশর ভাঙ্গিয়া তার হয়েছে শর লক্ষ ;
করিল প্রাণে কদম সম বিঁধিয়া দেহ বক্ষ।

এইরূপ 'সিন্ধুতীরে' শীর্ষক রূপক-কবিতাটির সহিত Leonora নামক একটি জার্ম্মাণ গাথার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সার ওয়াল্‌টার স্কট্‌ এই গাথাটির William and Helen নাম দিয়া একটি ইংরাজি অনুবাদ করিয়াছিলেন।

এই কবিতায় আমরা দেখি যে অর্দ্ধরাত্রে নিদ্রোত্থিতা হেলেন তাহার গৃহসম্মুখে এক অশ্বারোহী পুরুষ দণ্ডায়মান দেখিয়া তাহাকে তাহার প্রণয়ী উইলিয়ম বলিয়া চিনিতে পারে, এবং তাহার নির্দ্দেশক্রমে সে সেই পুরুষেরই পার্শ্বে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে। তারপরে বিদ্যুদ্‌বেগে ঘোড়া ছুটিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া তাহারা কত পথ অতিবাহন

করিল, কত দেশে, কত বন, কত প্রান্তর অতিক্রম করিল ; কিন্তু পুরুষটি একটি কথাও কহিল না, এমন কি তাহার মুখ পর্য্যন্ত ভাল করিয়া দেখা যাইতেছিল না।

তারপর রাত্রিশেষে অশ্বারোহী একটি গির্জ্জার মধ্যে এক উন্মুক্ত কবরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেইখানে সেই পুরুষমূর্ত্তি প্রথম কথা কহিল, এবং সে যে মৃত উইলিয়মের প্রেতাত্মা তাহা হেলেনকে জানাইয়া দিল।

রবীন্দ্রনাথ এই গাথাটি হইতে যদি 'সিন্ধুতীরে' কবিতার প্রেরণা পাইয়া থাকেন, তাহা হইলেও বলিতে হইবে তিনি গৃহীত আখ্যানটিকে উপলক্ষ-মাত্র করিয়া ভাব রাজ্যের অতি উচ্চস্তরে বিচরণ করিয়াছেন। সুতরাং মিল্‌টনের Il Penserosoর সহিত ফ্লেচারের একটী ক্ষুদ্র কবিতার যে সম্বন্ধ রবীন্দ্রনাথেরও এইসকল কবিতার সহিত সাদৃশ্যমূলক অন্যান্য কবিতার সেই সম্বন্ধ।

অনুসন্ধান করিলে হয়ত এরূপ সাদৃশ্য আরও অনেক বাহির করিতে পারা যায়। কিন্তু কবির শ্রেষ্ঠত্ব তাহাতে একটুও খর্ব্ব হয় না।

এইবার উপন্যাস ও গল্পসাহিত্যের কথা বলি। ক্ষেত্রে মৌলিকতা শুধু ভাবকে আশ্রয় করিয়া থাকিলে চলিবে না, আখ্যানগত হওয়াও চাই। যখন আমরা নূতন গল্প শুনিবার জন্য কোন উপন্যাস বা গল্প-পুস্তক পাঠে প্রবৃত্ত হই, তখন গল্পটি সত্যই নূতন হইবে ইহাই আশা করিয়া থাকি। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে প্লট বা আখ্যানাংশের মৌলিকতা একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করি।

অবশ্য ইহারও ব্যতিক্রম হইয়া থাকে, এমন কি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরও হাতে। যখন কোন লেখক সর্ব্বজন-পরিচিত কোন নাটক বা কাব্যের নামানুসারে স্বরচিত গল্পের নামকরণ করিয়া থাকেন, তখন তিনি সকলকে জানাইয়াই দিতেছেন যে পূর্ব্বপরিচিত উপাখ্যানের সহিত তাঁহার বর্ণিত কাহিনীর একটা সাদৃশ্য থাকিবে। কিন্তু এরূপ সাদৃশ্য সত্ত্বেও পাকা শিল্পীর হাতে এই শ্রেণীর গল্পও যে খুব উপভোগ্য হয় তাহার উদাহরণ টুর্গেনিভের Lear of the Steppes ও ব্রেট হার্টের The Iliad of Sandy Bar. কিংলিয়রের গল্প যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং আধুনিক জগতেও এরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে তাহাই টুর্গেনিভের গল্পে আমরা দেখিতে পাই ; অপর গল্পটিতে যে কলহ বর্ণিত হইয়াছে তাহার উপর ইলিয়াডের ক্ষীণ ছায়া পড়িয়াছে।

আমাদের সাহিত্যের কোন কোন উৎকৃষ্ট উপন্যাস ও গল্পের উপর ইংরাজি উপন্যাস-বিশেষের ছায়াপাত আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি। কিন্তু আর্টের দিক দিয়া সে বইগুলি এত সুন্দর যে মৌলিকতা হিসাবে সেগুলিতে কোন ত্রুটি আছে কিনা তাহার বিচার করিবার প্রয়োজন আমাদের মনে হয় না।

বঙ্কিমবাবুর ‘দুর্গেশনন্দিনীর’ সহিত স্কটের ‘আইভ্যাণ্‌হো’র সাদৃশ্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রকে নাকি এসম্বন্ধে একবার প্রশ্নও করা হইয়াছিল। শোনা যায়, তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, ‘দুর্গেশনন্দিনী’ লিখিবার পূর্ব্বে তিনি স্কটের উক্ত উপন্যাসখানি পড়েন নাই।

সে যাহা হউক, বঙ্কিমবাবুর এই প্রথম উপন্যাসখানির আখ্যানভাগ

যথেষ্ট পরিমাণে মৌলিক না হইলেও ইহা যে আমাদের সাহিত্যের একখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস তাহা স্বীকার করিতে কেহ কুণ্ঠিত হইবেন কি ?

আরও একখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের উদাহরণ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিব, উৎকৃষ্টতা হিসাবে যাহার স্থান 'দুর্গেশনন্দিনী'রও অনেক উপরে এবং যাহার মৌলিকতা সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত কোন প্রশ্ন উঠিয়াছে বলিয়া আমি অবগত নহি। ইহা হইতেছে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'।

এই সুবৃহৎ উপন্যাসখানির প্লট খুব ঘোরালো নয়। কিন্তু যেটুকু প্লট অবলম্বন করিয়া এই উপন্যাসের চরিত্রগুলি প্রকটিত হইয়াছে প্রায় তাহার সমস্তটুকুই জর্জ্জ ইলিয়েটের ডেনিয়েল ডেরোণ্ডা (Daniel Deronda) নামক উপন্যাসটিতে দেখিতে পাই।

ডেনিয়েল খ্রীষ্টান পরিবারে পালিত এবং নিজেকে খ্রীষ্টান বলিয়াই জানে; কিন্তু তাহার জন্ম রহস্যাবৃত ছিল। সে গোরার ন্যায়ই স্বদেশপ্রেমিক; সকল সৎকার্য্যেই সে অগ্রণী, একদিন সে নদীতে আত্মহত্যায় উদ্যতা এক সুন্দরী য়িহুদী যুবতীকে উদ্ধার করিয়া তাহার বন্ধুর বাড়ীতে তাহাকে রাখিয়া আসে। এই মেয়েটীর নাম মীরা। মীরা ডেনিয়েলের প্রেমে পড়িল। ক্রমে ডেনিয়েলও বুঝিতে পারে যে, সে মীরাকে ভালবাসে। দুইজনে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী মনে করিয়া ডেনিয়েল যখন মীরাকে লাভ করিবার আশা বিসর্জ্জন দিয়াছিল, তখন একদিন হঠাৎ সে জানিতে পারিল যে সে খ্রীষ্টান নয়, তাহার জন্ম এক য়িহুদী পরিবারে। তখন আর বিবাহের কোন বাধা রহিল না।

প্লটের এই একই কাঠামো উভয় উপন্যাসে প্রতিভাবান শিল্পীর হাতে

এমনই স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিয়াছে যে গোরাকে ডেনিয়েল ডেরোণ্ডার অনুকরণ বলা ঘোর ধৃষ্টতার পরিচায়ক হইবে।

রবীন্দ্রনাথের কোন কোন ছোট গল্পেরও উপাদান পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে হয়ত গৃহীত হইয়াছে। টলষ্টয়ের Resurrection নামক উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ পড়িলেই রবীন্দ্রনাথের 'বিচারক' গল্পটি মনে পড়িয়া যায় ষ্ট্যাট্যুটারি সিভিলিয়ান মোহিতমোহন প্রথম যৌবনে ছাত্রাবস্থায় যে বালিকাটীর সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন, বহুকাল পরে যখন তিনি 'বিচারক' পদে আসীন, তখন তাঁহারই এজলাসে সন্তান-হত্যা ও আত্মহত্যা চেষ্টার অপরাধে সেই রমণীই অভিযুক্ত—রবীন্দ্রনাথের গল্পে অদৃষ্টের এই নিষ্ঠুর পরিহাস অভিনীত হইতে দেখি।

টলষ্টয়ের উপন্যাসের সম্ভ্রান্তবংশীয় নায়ক বিচারালয়ে জুরিতে বসিয়া কাঠগড়ায় যে নারীকে অপরাধিনীরূপে দণ্ডায়মানা দেখিল, সেই সমাজ-পরিত্যক্তা নারী তাহারই প্রথম যৌবনের উদ্দাম অসংযমের সমস্ত শাস্তি, সমস্ত কলঙ্ক নিজ মস্তকে বহন করিয়া সেই মুহূর্ত্তে বিচারকের দণ্ডাজ্ঞার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। সাদৃশ্য বেশ স্পষ্ট, তবু রবীন্দ্রনাথের 'বিচারক' আমাদের গল্পসাহিত্যের একটি রত্ন।

তাঁহার 'স্ত্রীর পত্র' ও ইব্‌সেনের 'Dolls House' এর মধ্যেও বেশ একটা ভাবসাম্য আছে।

পাশ্চাত্য সাহিত্যেও যাঁহারা শীর্ষস্থানীয় বলিয়া গণ্য তাঁহাদের উপন্যাসাবলীতেও সমগ্র ভাবে না হউক, ঘটনায় বা চরিত্রে বিলক্ষণ মিল লক্ষিত হয়। মোটের উপর ধরিতে গেলে হয়ত জর্জ্জ মেরিডিথের Ordeal of Richard Feveril. ও টুর্গেনিভের Torrents of Spring

নামক উপন্যাসদ্বয়ের মধ্যে আখ্যানগত বৈষম্যই বর্ত্তমান। কিন্তু তাহা হইলেও উভয় উপন্যাসেরই যেটি প্রধান ঘটনা তাহাতে প্রকৃতপক্ষে বিশেষ পার্থক্য নাই। উভয় উপন্যাসেরই নায়ক সচ্চরিত্র যুবক; যখন তাহারা প্রেমে পড়িল তখন তাহাদের সেই প্রেম যেমনই গভীর, তেমনই পবিত্র। রিচার্ড তাহার প্রণয়িনীকে স্বীয় পিতার ঘোর অসম্মতি সত্ত্বেও বিবাহ করিল; অপর উপন্যাসের নায়ক তাহার প্রেয়সীকে আর একদিন পরেই গৃহলক্ষ্মী করিবে; কিন্তু অভাবনীয় ঘটনাচক্রে পড়িয়া উভয়েই কুহকিনী নারীর প্রলোভনে একমুহূর্ত্তে প্রেম, ধর্ম্ম, সুখ সমস্ত বিসর্জ্জন দিল। বিভিন্ন সাহিত্যের দুইখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের সর্ব্বপ্রধান ঘটনার এই মিল অনুধাবনযোগ্য নহে কি?

কখনও কখনও এমনও দেখা যায় যে ঘটনার এইরূপ সাদৃশ্য না থাকিলেও একটি উপন্যাসের কোন বিশেষ স্মরণীয় চরিত্র অন্য উপন্যাসে নিজের সমস্ত বিশেষত্ব লইয়া ভিন্ন মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছে।

এইরূপ চারিত্রিক পুনর্জ্জন্মের প্রকৃষ্ট উদাহরণ তিনটী বিভিন্ন দেশের তিনখানি উপন্যাস হইতে দেওয়া যাইতে পারে। গেটের Wilhelm Meister নামক উপন্যাসের লাস্যলীলাময়ী আনন্দোচ্ছ্বাসস্বরূপিণী Mignon ভিক্টর হুগোর Notre Dameএ Ismoralda রূপে এবং স্কটের Peveril of the Peakএ ফেনেলা (Fenella) চরিত্রে নবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে।

আমাদের সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' এবং শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহে'র মধ্যে ঘটনার পার্থক্যসত্ত্বেও একটি চরিত্রগত ঐক্যের ভাব চোখে পড়ে। অন্ততঃ, এই দুইখানি গ্রন্থের মধ্যে এইরূপ একটা তুলনামূলক আলোচনার অবসর পাওয়া যায়।

নিখিলেশের সহিত মহিমের এবং সন্দীপের সহিত সুরেশের তুলনা স্বতঃই মনে আসে। অচলা ঠিক বিমলা নয় বটে, কিন্তু অবস্থার ক্রীড়নক এবং পরপুরুষে আসক্তারূপে এই দুই নায়িকা যেরূপ চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে একটি বেশ সাদৃশ্য আছে।

প্রভেদের মধ্যে এই যে বিমলাকে রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্য্যন্ত সন্দীপের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছেন; কিন্তু এরূপ ভীষণ ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন পুরুষের লোলুপ গ্রাস হইতে দুর্ব্বল-প্রকৃতি নারী যে নিজেকে রক্ষা করিতে পারে না, বিশেষতঃ আদর্শচরিত্র স্বামী যদি তাহাকে পূর্ণস্বাধীনতা দেয়, অচলার শোচনীয় পরিণামে শরৎচন্দ্র তাহাই দেখাইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে যাহা idealistic বা আদর্শসৃষ্টি, 'গৃহদাহে' তাহাই realistic বা বাস্তবজগতের বিষয় হইয়াছে।

ঠিক এইরূপ একটা তুলনামূলক সমালোচনা বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'র মধ্যে চলিতে পারে। একদিকে গোবিন্দলাল, ভ্রমর, রোহিণী; অপরদিকে মহেন্দ্রনাথ, আশা, বিনোদিনী। কিন্তু এখানেও একটা পার্থক্য আছে। বিনোদিনী মহেন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করিলেও রোহিণীর ন্যায় পাপিষ্ঠা নয়। ফলে, গোবিন্দলালের ভীষণ ট্রাজিডি মহেন্দ্রনাথের পক্ষে অর্দ্ধপথে থামিয়া গিয়াছে।

'বিষবৃক্ষে' এই একই তথ্য রূপজ মোহের প্রাবল্যের মধ্যে নিহিত। নগেন্দ্রনাথ মহেন্দ্রের ন্যায়ই দুর্ব্বলচিত্ত এবং ভালমন্দ বিচার ত্যাগ করিয়া রূপের আগুনে ঝাঁপ দিয়াছিল।

এইখানে একটু অপ্রাসঙ্গিক হইলেও একটা কথা বলিয়া

রাখি। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সকল উপন্যাসেই চরিত্রগুলিকে পাপের পঙ্কিলতা হইতে সযত্নে রক্ষা করিয়াছেন!

'নষ্টনীড়', 'ঘরে বাইরে', 'চোখের বালি' সর্ব্বত্রই এই একই চিত্র। বঙ্কিমচন্দ্রে ও শরৎচন্দ্রে মানবচরিত্রের দুর্ব্বলতার দিকটা বেশী প্রকট হইয়াছে, ট্রাজিডিও গভীরতর হইয়াছে।

গোবিন্দলাল ও রোহিণী, সুরেশ ও অচলা এই হিসাবে রবীন্দ্রনাথের মহেন্দ্রনাথ ও বিনোদিনী বা সন্দীপ ও বিমলা হইতে স্বতন্ত্র।

উপরে যে কয়খানি উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্রগত সাদৃশ্যের কথা বলা হইল, সেগুলির মধ্যে কোনটিরই যে মৌলিকতা অপর কোনটির সঙ্গে তুলনায় হীন তাহা মনে করিবার কারণ নাই। পবিত্র দাম্পত্যপ্রেমের পার্শ্বে উন্মত্ত লালসার বিষময় ফল-প্রদর্শন যে অনেক উপন্যাসের আখ্যানভাগের বিষয়ীভূত হইয়াছে, তাহার কারণ ইহা নয় যে, একজন অপরের নিকট হইতে ইহার ভাব গ্রহণ করিয়াছেন; তাহার কারণ ইহাই যে, এরূপ ব্যাপার জগতে সর্ব্বত্র অত্যন্ত সাধারণ।

তাই পাশ্চাত্য সাহিত্যে যেমন Ordeal of Richard Feveril বা Torrents of Spring (থ্যাকারের Vanity Fair ও জর্জ্জ ইলিয়টের Mill on the Flossএর স্থানবিশেষেরও উল্লেখ করা যাইতে পারে), আমাদের সাহিত্যেও তেমনই 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বা 'চোখের বালি'র মত উপন্যাস ঐ একই চিত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। আর যদিও বা কোন কোন ক্ষেত্রে কোন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ভাব বা প্রেরণার জন্য অপরের নিকট ঋণীই হ'ন তাহা হইলেও সেই প্রতিভাবান্ লেখক পরস্বকে এমনইভাবে নিজস্ব করিয়া লইতে

জানেন যে, পাঠক বা সমালোচক কাহারও নিকট সেই ঋণগ্রহণটি অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় না। শুধু কাব্য ও নাটকেই নয়, মৌলিকতার দাবী যেখানে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সেই উপন্যাসের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম খাটে।

এপর্য্যন্ত আমরা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের কথাই আলোচনা করিয়াছি। নিকৃষ্ট লেখকের হাতে মৌলিকতার অভাব যে অক্ষম অনুকরণের পরিচায়ক তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হয় না। সে অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ লইতে বিরত হইলাম।

স্বভাব-কবি গোবিন্দদাস

কুঙ্কুম, কস্তুরী, চন্দন প্রভৃতির কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস জীবদ্দশায়ই সাধারণের নিকট যথোচিত সমাদর লাভ করিতে পারেন নাই; সুতরাং মৃত্যুর পর লোকে যে তাঁহাকে প্রায় বিস্মৃত হইয়া যাইবে, তাহাই স্বাভাবিক। হইয়াছেও তাহাই। জীবনব্যাপী দুঃখদারিদ্র্যের তীব্র হলাহল নিজে আকণ্ঠ পান করিয়া সুমধুর কাব্যামৃত তিনি বঙ্গবাসীকে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দরিদ্র কবির সে দান বাঙ্গালী উপেক্ষায় অবহেলায় দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে। বাজারে তাঁহার বইগুলি কিনিতে পাওয়া যায় না; কাহারও মুখে আজ তাঁহার নামও বড় শোনা যায় না।

কিন্তু সত্যই কি তিনি এই গভীর অনাদরের যোগ্য? একথা সত্য বটে যে শ্রেষ্ঠ কবি ব্যতীত অমরত্বের দাবী কেহ করিতে পারে না, এবং গোবিন্দচন্দ্র রবীন্দ্র, মাইকেলের সঙ্গে তুলিত হইতে পারেন না। কিন্তু ইহাও কি সত্য নয় যে রবীন্দ্রীয় যুগে কবিসূর্য্যের অত্যুজ্জ্বল প্রতিভালোক যখন সকল লোকেরই চোখ ধাঁধিয়া দিতেছিল, যখন গিরিশ-দ্বিজেন্দ্রের অসামান্য নাট্য-প্রতিভা বাঙ্গালীর জাতীয় ও সামাজিক জীবনকে বিচিত্র আকারে প্রকাশ করিতেছিল, তখন অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি যে তিন চারিজন কবি তাঁহাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বাঙ্গালীকে

আনন্দ দান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; গোবিন্দদাস তাঁহাদেরই অন্যতম ছিলেন ? সুতরাং একথা আমাদিগকে মানিতেই হইবে যে যদি তাঁহার অবস্থা অনুকূল হইত, যদি তাঁহার পুস্তকগুলি ভাল করিয়া ছাপাইবার ও বিজ্ঞাপন দিবার সঙ্গতি থাকিত এবং অর্থাভাববশতঃ বহু সুন্দর কবিতা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার অক্ষমতা না হইত, তাহা হইলে হয়ত আমরা তাঁহার প্রতি এতটা ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতে পারিতাম না। তিনি যে একজন প্রকৃত কবি ছিলেন তাহা সর্ব্বজনস্বীকৃত : কবির মৃত্যুর পর সুকবি কালিদাস রায় তাঁহাকে আহ্বান করিয়া যে বলিয়াছিলেন—

চেষ্টা ক'রে হওনি কবি, কবি হ'য়েই জন্ম নিলে
প্রাচীন শ্যামল বাংলামাটি চিরে ;
তোমার কবি-প্রতিভাটির প্রতিমাটি তিলে তিলে
তৈরি নহে শিল্পশালার ভিড়ে।

তাহা স্বভাব কবি গোবিন্দদাস সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সত্য।

প্রকৃতির উদার ক্ষেত্রে বনের পাখী যেমন গান গাহিয়া বেড়ায়, কেহ শুনিল কিনা চাহিয়াও দেখে না, তেমনই স্বভাবের শিশু এই অখ্যাত কবিটি আপনার অন্তর্নিহিত কবিত্বের প্রেরণায় গাহিয়া গিয়াছেন, নিন্দা সুখ্যাতির অপেক্ষা রাখেন নাই।

সে আজ অনেক দিনের কথা যখন গোবিন্দচন্দ্রের প্রথম কবিতা পুস্তক 'প্রেম ও ফুল' বাঙ্গালার সাহিত্যামোদিগণের হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব পুলক-স্পন্দনের সঞ্চার করিয়াছিল। হেম-নবীনের যুগ তখনও শেষ হয়

নাই, বাঙ্গালার সাহিত্যাকাশ রবিপ্রভায় তখনও পূর্ণ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই, বাঙ্গালার সারস্বত কুঞ্জে তখনও অন্যান্য কবিদের প্রভাতী গানের ঝঙ্কার ভাল করিয়া শোনা যায় নাই। রবীন্দ্রনাথের 'সোণার তরী' ইহার চারি বৎসর পরে প্রকাশিত হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল তখনও প্রায় অজ্ঞাত; তাঁহার 'আর্য্যগাথা'র প্রথমভাগ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয় কুমারও তখন সবে মাত্র কবি-খ্যাতি অর্জ্জন করিতেছেন সেই সময়ে আর একজন কবির যশ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এবং ইহার অল্পদিন পরেই—যৌবনেই তাঁহার ভবলীলা সাঙ্গ হইয়া যায়। তাঁহার নাম রাজকৃষ্ণ রায়। দুইজনের জীবনের অবস্থাগত সাদৃশ্য বড় বেশী চোখে পড়ে। একই সময়ে দুইজনের জন্ম—গেবিন্দদাস ১২৬১ সালে, রাজকৃষ্ণ রায় পরবৎসরে। দারিদ্র্যের জন্য উভয়েরই উপযুক্ত শিক্ষার অভাব এবং অশেষ দুঃখ দুর্দ্দশার মধ্যে উভয়েরই সারাটা জীবন-যাপন—এরূপ ব্যাপার আর কোন সাহিত্যিকের জীবনে দেখা যায় না। দুইজনেরই কবি-প্রতিভা খুব অল্প বয়সেই বিকশিত এবং দুইজনেই একই ভাবে অনাদৃত ও উপেক্ষিত! প্রভেদের মধ্যে এই যে রাজকৃষ্ণ রায় আটত্রিশ বৎসর মাত্র বয়সেই দুর্দ্দশার তাড়নায় ধরাধাম ত্যাগ করিয়া যান, কিন্তু গোবিন্দদাস ঘোর প্রতিকূল অদৃষ্টের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া ৬৪ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া ছিলেন।

এই সমভাগ্য কবিদ্বয় পরস্পরের নিকট অজ্ঞাতও ছিলেন না। রাজকৃষ্ণ রায়ের 'বীণা' পত্রিকাতেই গোবিন্দচন্দ্রের কবি-জীবনের সূচনা হয়! রাজকৃষ্ণ রায় অনাদৃত হইলেও তাহার গ্রন্থাবলী এখনও কিনিতে পাওয়া যায় এবং তাঁহার 'নরমেধ যজ্ঞ', 'প্রহ্লাদ চরিত্র' প্রভৃতি

কোন কোন নাটক এখনও মাঝে মাঝে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়া থাকে। কিন্তু গোবিন্দদাস এই কয় বৎসরের মধ্যেই বিস্মৃত-প্রায়।

এই বিস্মৃতির কবল হইতে তাঁহাকে বাঁচাইবার চেষ্টায় কবির বন্ধু শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী তাঁহার জীবনচরিত প্রকাশিত করিয়া বঙ্গবাসী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

এই সুলিখিত পুস্তকখানি লেখকের লিপিকুশলতার গুণে অতিশয় হৃদয়গ্রাহী এবং উপন্যাসের ন্যায় চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

ইহা পাঠ করিয়া কবিকে চিনিয়া লইতে এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হয় না। গ্রন্থকারের একটি প্রধান গুণ তাঁহার নির্ভীকতা ও নিরপেক্ষতা। তিনি কাহারও ভয়ে কোন সত্য বা তথ্য গোপন করেন নাই। এবং কবির বন্ধু হইলেও তাঁহার দৌর্ব্বল্যের দিকটিও দেখাইতে কুণ্ঠিত হন নাই।

আমরা দেখিতে পাই, কবি গোবিন্দদাস একদিকে যেমন প্রবলের ঘোর অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়াছিলেন, অপরদিকে তেমনই স্বীয় চরিত্রগত অব্যবস্থিত-চিত্ততার জন্য অনেক সময়ে নিজের বিপদ নিজে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন।

এই দুইটী কারণ—একটি ভিতরের, অন্যটি বাহিরের—দুষ্ট গ্রহের ন্যায় কবির প্রায় সমস্ত দুঃখদুর্দ্দশার মূলে যে বর্ত্তমান ছিল তাহা লেখক অতি সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। এই সত্যবাদিতা গ্রন্থখানিকে অতিশয় মূল্যবান করিয়া তুলিয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালা-ভাষায় আরও কয়েকখানি জীবনচরিত পাঠ করিয়াছিলাম। সে সব পুস্তকের স্থলে স্থলে সত্যের অপলাপ দেখিয়া কষ্ট বোধ করিয়াছিলাম, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মাসিকের পৃষ্ঠায়

তীব্রভাবে প্রতিবাদ করিতেও বাধ্য হইয়াছিলাম। গোবিন্দদাস দরিদ্র হইলেও তেজস্বী, নির্ভীক ও সত্যবাদী ছিলেন। তাঁহার জীবনচরিত লেখকেও সেই সকল গুণের সমাবেশ দেখিয়া সকলেই প্রীত হইবেন।

দরিদ্র পরিবারেই এই পল্লীকবির জন্ম, এবং আজীবন ভীষণ দারিদ্র্যের সঙ্গে তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। 'শতগ্রন্থি ছিন্নবাস, একাহার উপবাস' ব্যতীত তাঁহার ভাগ্যে আর কিছু জোটে নাই। কিন্তু দারিদ্র্যেই যদি তাঁহার সমস্ত দুঃখ পর্য্যবসিত হইত, তাহা হইলে ত তাঁহাকে সুখী বলা যাইতে পারিত। প্রথমা পত্নী ও দুই কন্যার মৃত্যু তাঁহার জীবনে বিষাদের গাঢ় ছায়া আনিয়া দিয়াছিল, তাহাও সত্য। কিন্তু ইহাও কিছু অসাধারণ নহে। আমাদের দেশের অনেক কবিরই নাম করিতে পারা যায় যাঁহাদের বুকে পত্নীবিয়োগজনিত শোকের ব্যথা বাজিয়াছিল। সন্তানের মৃত্যুশোক ভোগ করিতে হয় নাই এমন লোকও বিরল। অবশ্য দারিদ্র্য-দুঃখের সহিত স্বজন-বিয়োগ-শোক মিলিত হওয়ায় এই উভয়বিধ কষ্টই গোবিন্দদাসের পক্ষে তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু জীবনে যে দুঃখ তাঁহার দুর্ব্বিষহ হইয়াছিল তাহা হইতেছে—বিনাদোষে স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসন। তাঁহার যে বাসভূমি জয়দেবপুর (ভাওয়াল) গ্রামটিকে তিনি 'শতস্বর্গ, শতকাশী' অপেক্ষা ভালবাসিতেন, সেখান হইতে মিথ্যা অপবাদে যখন খামখেয়ালী জমিদারের কঠোর আদেশে নির্ব্বাসিত হইলেন, তখন তাঁহার দুঃখের ভরা পূর্ণ হইল। তাঁহার 'চন্দন' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত নির্ব্বাসিতের আবেদন নামক কবিতা পাঠ করিলে পাষাণ-হৃদয়ও বিগলিত হয়। হেমবাবু তাঁহার 'গোবিন্দদাসে' এই ব্যাপারটির যে বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন তাহা

হইতে জানিতে পারি যে, এই অত্যাচারের মূলে ছিলেন ঢাকার একজন সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক—এবং এই প্রবল প্রতাপশালী ব্যক্তিটির কুচক্রান্তে গোবিন্দদাসকে অনেক দুর্গতি ভোগ করিতে হইয়াছে। এই অত্যাচারের যখন কোন প্রতিবিধান হইল না, তখন কবি তাহার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন অতি তীব্র ভাষায় 'মগের মুলুক' নামক ব্যঙ্গ-কাব্য লিখিয়া।

এই আক্রমণে গোবিন্দদাস সংযম রক্ষা করিতে পারেন নাই। ফলে তাঁহাকে মানহানির মোকদ্দমায় জড়িত হইয়া পড়িতে হইয়াছিল। এই সব কারণে তাঁহার জীবনটা এতই তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, শেষ জীবনে যখন একটি সুদীর্ঘ রোগভোগের পর আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে তিনি মুক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন তিনি 'কেন বাঁচালে আমায়' শীর্ষক একটি সুকরুণ কবিতায় এইরূপ মর্ম্মন্তুদ ভাষায় নিজের দুঃখ নিবেদন করিয়াছিলেন—

কেন বাঁচালে আমায় ?

আমি ভেবেছিনু, হরি এবার করুণা করি
ঘুচাইবে অভাগার এ ভবের দায়,
যত দুঃখ, যত ক্লেশ সকলি হইবে শেষ,
কাঁদিতে হবে না আর ব্যথা বেদনায়।
আমি ত ভাবিনি রোগ, ভেবেছি মাহেন্দ্রযোগ
তিলে তিলে পলে পলে আশায় আশায়,
ভেবেছি মরণ মাঝি লইতে আসিবে আজি
অচিরে ভেটিব গিয়ে তব রাঙ্গা পায়।

এই করুণ বিলাপোক্তি পাঠ করিয়া টেনিসনের কয়েক ছত্র মনে পড়িয়া যায়—

For sure no gladlier does the stranded wreck
See through the gray skirts of a lifting squall,
The boat that bears the hope of life approach
To save the life despaired of, then he saw
Death dawning on him, and the close of all.

মজ্জমান পোত-বক্ষে নর নিঃসহায়
দেখে যবে ঝঞ্ঝামুক্ত দিগন্তের কোলে
একটি তরণী আসে রক্ষিতে তাহায়,
আশ্বাসে, উল্লাসে যথা হৃদি তার দোলে,
ততোধিক পুলকিত অন্তরে নিশ্চয়
হেরিল এ হতভাগ্য মৃত্যুর আলোকে—
অন্ধকার নিশা শেষে উষাভাস প্রায় ;
আজি তার অবসান সর্ব্বদুঃখ শোক।

তাঁহার মুক্তির এই 'মাহেন্দ্রযোগ' আসিতেও আর বড় বিলম্ব হইল না। ইহার তিন বৎসর পরে, ১৩২৫ সালের আশ্বিনের এক মধুর উষায় ঢাকা নগরীর এক নিভৃত গৃহে কবি সত্যেন্দ্রনাথের ভাষায়, 'ফুল নীরবে যেমন ঝরে তেমনি ক'রে ম'রে গেল কবি।'

তাঁহার জীবন চরিতকার লিখিতেছেন—'মৃত কবির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ কোন কবি, কি লেখক, কি সাহিত্যিক তাহার শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন বলিয়া শুনা যায় নাই। দেশবাসিগণের নিকট তিনি পূর্ব্বাপর যে ব্যবহার পাইয়া গিয়াছেন শেষ দশায়ও তাহার একটুও তারতম্য হয় নাই।'

তাঁহার মৃত্যুর পর অবশ্য এই নিয়মের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইয়াছিল। নানা সাময়িক পত্রে তাঁহার সম্বন্ধে শোকসূচক ও প্রশংসাপূর্ণ আলোচনা বাহির হইয়াছিল। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কালিদাস রায় প্রমুখ কবিগণ

তাঁহার প্রয়াণ-গীতি গাহিয়া তাঁহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন তিনি সমস্ত নিন্দাখ্যাতির বাহিরে।

এইবার গোবিন্দদাসের কাব্য সম্বন্ধে দু'এক কথা বলিয়া এই ক্ষুদ্র আলোচনার উপসংহার করিব। গোবিন্দদাস কোন্ শ্রেণীর কবি ছিলেন আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের কোন্ কবির সহিত তাঁহার তুলনা হইতে পারে, এই সব প্রসঙ্গের উত্থাপন না করিয়াও একথা অসঙ্কোচে বলিতে পারা যায় যে, খুব উচ্চ না হইলেও একটা স্থায়ী আসন তিনি বাঙ্গালার কাব্য-সাহিত্যে চিরকাল অধিকার করিয়া থাকিবেন। তাঁহার কাব্যে ভাবের খুব গভীরতা না থাকিতে পারে, শিক্ষার অসম্পূর্ণতা বশতঃ আর্টের দিক হইতেও তাঁহার কাব্য সৌন্দর্য্যের অনেকস্থলে হানি হইয়াছে সত্য, কিন্তু তথাপি তাঁহার "হৃদয়ের উৎসমুখ হ'তে" যে অজস্র কবিত্বধারা স্বতঃ উৎ-সারিত হইয়া বাঙ্গালার গীতিকুঞ্জের একপার্শ্বে মৃদুকলধ্বনিতে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা পার্ব্বত্য নির্ঝরের ন্যায়ই স্বচ্ছ,স্নিগ্ধ ও সুন্দর,এবং তাহারই ন্যায় তাহা সকল বাধা-বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া আপনার বেগে বহিয়া চলিয়াছে। প্রতিভালোক-সম্পাতে তাহা সর্ব্বত্র ঝলমল করিতেছে, এবং প্রকৃতির লীলা তাহার বুকে প্রতিফলিত হইয়া তাহাকে বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছে। এক কথায় তাঁহার 'স্বভাব-কবি' নাম সার্থক হইয়াছে।

অন্যান্য কবিদের ন্যায় গোবিন্দদাসও প্রেমের কবিতাই বেশী লিখিয়াছেন; কিন্তু এই প্রেম নায়ক-নায়িকার প্রেম নয়, ইহা কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেনের বিচিত্র প্রেমের ন্যায় মধুর দাম্পত্যভাবে মণ্ডিত। আরও একটি বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে গোবিন্দচন্দ্রের সাদৃশ্য খুব বেশী। একটি মাত্র কবিত্বপূর্ণ ভাব নানা বিচিত্র উপমাদ্বারা প্রকাশ করিবার এই উভয়

কবিরই এরূপ অসাধারণ ক্ষমতা যে, ভাবটি পাঠকের চোখের সামনে কল্পনার রঙ্গীন লীলায় একটির পর একটি চিত্রে মূর্ত্ত হইয়া উঠিতে থাকে।

দেবেন্দ্রনাথের অনেক কবিতা হইতে ইহার উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। গোবিন্দদাসের 'কস্তুরী' কাব্যের 'কে বেশী সুন্দর' কবিতা ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণস্থল। কবি বালিকা ও যুবতীর সৌন্দর্য্যের এইরূপ তুলনা করিতেছেন :—

কে বেশী সুন্দর !

যুবতীর ভরা গায় লাবণ্য উছলি যায়,
নয়নে নলিন নীল, মুখে শশধর।
বালিকা তারকা হাসে নিষ্কলঙ্ক নীলাকাশে
সদা শুক্লপক্ষ পূর্ণ ক্ষুদ্র কলেবর
শতমুখে ভালবাসে তরঙ্গে মাতঙ্গ ভাসে
যুবতী পদ্মার মত বহে খরতর;
ফুলবনে করে খেলা প্রদোষ প্রভাত বেলা
অনাবিল প্রেমধারা বালিকা নির্ঝর।
প্রভাতের শতদলে পরিপূর্ণ পরিমলে
যুবতী সহস্র-করে ফোটে মনোহর;
শিশিরের শেফালিকা নিশি শেষে সে বালিকা
খসে পড়ে ছোঁয় পাশে একটি ভ্রমর!
যুবতী বিজলী জ্বালা ত্রিভুবন করে আলা
সগর্ব্বে চরণাঘাতে ভাঙ্গে ধরাধর;
বালিকা জোনাকি হাসে, স্নেহের কিরণে ভাসে
শিখেনি অশনি-লীলা আঁখি ইন্দীবর।
ইত্যাদি।

এরূপ উদাহরণ আরও অনেক দিতে পারা যায়।

গোবিন্দদাস স্বদেশ-প্রেমিক কবি ছিলেন। তাঁহার জ্বলন্ত স্বদেশ-প্রেম নানা কবিতায় উজ্জ্বলভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। প্রধানতঃ 'নব্য ভারতে'

এই সকল কবিতা প্রকাশিত হইত; পুস্তকাকারে সুসম্বদ্ধভাবে তিনি আমাদিগকে এই কবিতাগুলি দিয়া যাইতে পারেন নাই। আমাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া একস্থানে তিনি লিখিতেছেন—

আমরা.মরিলে বাঁচি, বাঁচিয়া মরিয়া আছি,
ভারতে জনম শুধু মরণ কারণ।

আবার অন্যত্র বাঙ্গালীর মনুষ্যত্বহীনতা দেখিয়া গভীর আক্ষেপে বলিয়াছেন—

বাঙ্গালী মানুষ যদি প্রেত কারে কয়?

একবার রথযাত্রার সময় কবি লিখিলেন—

আবার লইয়া রথ, উজলিতে এ ভারত
যদি হে আসিলে জগন্নাথ,
কিন্তু কেন রথ খালি, হে কৃষ্ণ, হে বনমালী,
কোথা সে অর্জ্জুন তব সাথ?
কোথা রাজা যুধিষ্ঠির, কোথা বৃকোদর বীর
সহদেব কোথা সে নকুল?
আজিও অজ্ঞাতবাস? আজো বিরাটের দাস?
আজিও কি ভাঙ্গে নাই ভুল?
কোথা বীর ধনঞ্জয় রহিয়াছে ·এ সময়?
কেহ যে হয় না আগুসার?
ক্লীব কাপুরুষ বেশে ঘৃণিত দাসত্ব ক্লেশে
জীবন যাপিব কত আর?

এই তীব্র জ্বালাময়ী উক্তি যে কাহাদের প্রতি প্রযুক্ত তাহা কাহারও বুঝিতে বাকি থাকে না। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি এই স্বদেশ-প্রীতির গান গাহিয়া দেশবাসীর মনে উদ্দীপনার—সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন। যে মাসে তিনি আমাদের নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করেন সে

মাসের নব্যভারতে 'অসুর পূজা' নামে তাঁহার একটি কবিতা বাহির হয়। তাহার কিয়দংশ এইরূপ—

ধন্য তুমি হে বীরেন্দ্র, অসুর দুর্ব্বিজয়।
শৌর্য্য তোমার, বীর্য্য তোমার, অনন্ত অক্ষয়।
ধন্য তোমার স্বদেশ প্রীতি, ধন্য তোমার অসুর-নীতি
ধন্য তোমার পুণ্যস্মৃতি বিনাশ করে ভয়।
তোমার ভীষণ রুদ্র মূর্ত্তি, স্বাধীনতার অগ্নিস্ফূর্ত্তি
মরণ-কাঁপা দিগ্বিজয় কি চরণ চাপা রয়?
তোমার আঁখির সতেজ ভাষা, বিশ্বজয়ের বিপুল আশা
এক নিমিষে করে যে সে জগৎ জ্যোতির্ম্ময়।
তোমার প্রবল স্বদেশভক্তি উঠছে ঠেলে সকল শক্তি
ধবলগিরির চেয়ে সে যে প্রবল অতিশয়।

ইংরাজী শিক্ষিত না হইলেও গোবিন্দদাস সমাজ-সংস্কারের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। অনেক ভাল ভাল কবিতা তিনি এই উদ্দেশ্যে লিখিয়াছেন। বাল্য-বিবাহ, বর-পণ প্রভৃতি কুপ্রথার বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় অনেক কবিতা তিনি রচনা করিয়াছেন। স্নেহলতার আত্মহত্যার পর দেশে যখন একটা ঘোর আন্দোলন আরম্ভ হয় তখন সর্ব্বত্র স্নেহলতার ছবি খুব বিক্রয় হইতেছিল। এই চিত্রের নিম্নে গোবিন্দদাসের এই কয়েক ছত্র কবিতা মুদ্রিত থাকিত—

রাজপুতানী মেয়ের মত, কর্ব্ব না হয় জহরব্রত
তারাও নারী, মোরাও নারী,—নারীর হৃদয় দিয়া।
থাকুক আমার বিয়া।

গোবিন্দদাস নিজে কিন্তু এরূপ আত্মহত্যা অতীব দূষণীয় বলিয়া মনে

করিয়াছিলেন এবং কিছুতেই ইহার প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয় মনে করিয়া স্নেহলতার হঠকারিতার নিন্দা করিয়া এক কবিতা লিখিয়াছিলেন। কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি,—

কাল্ল কি রে হতভাগী কেরোসিনে পুড়ে।
নারীর মড়ক লাগাইলি বাঙ্গলা মুলুক জুড়ে।
মনে যদি খেদ্ ছিল তোর কর্ব্বি না তুই বিয়া,—
কে নিচ্ছল কলাতলায়, গলায় গামছা দিয়া?
আর্য্য নারীর কার্য্য নয় এ আত্মহত্যা করা—
ইহকালের পরকালের নিন্দা নরক ভরা।
এ'ত নয় সে জহর ব্রত, এ যে বিষম পাপ,
নির্নিমিত্তে আত্মহত্যা বিধির অভিশাপ।
লোকের হিতে, দেশের হিতে সমর্পিলে প্রাণ—
সে ত নয় রে আত্মহত্যা, সে যে আত্মদান।
আত্মদান আর আত্মহত্যা স্বর্গ নরক ভেদ,
বুঝলি না তুই বোকা মেয়ে ঐত বড় খেদ।

এই শ্রেণীর আরও অনেক কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে ইচ্ছা করে। কিন্তু এই ক্ষুদ্র পরিসরে তাহা সম্ভব নয় তাঁহার কাব্যের অন্যান্য দিক সম্বন্ধেও আজ আর কিছু বলা হইল না।

হেমবাবুর লিখিত জীবনচরিতখানি যদি এই অবজ্ঞাত কবির দিকে সাধারণের দৃষ্টি একটুও আকৃষ্ট করে তাহা হইলে তাঁহার শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হইবে। তিনি তাঁহার গুরুতর কর্ত্তব্য খুব যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়াছেন। গ্রন্থের পুরোভাগে তিনি বঙ্কিমবাবুর এই উক্তিটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—"কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে সন্দেহ নাই; কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ।"

লেখক যে আমাদিগকে কবি গোবিন্দদাসকে বুঝিতে বিশেষ সাহায্য

করিয়াছেন তাহা আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিব, এবং সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ সাহিত্যিক আর, এল, ষ্টিভন্‌সনের ভাষায় বলিব,—

'Biography usually so false to its office, does here for once perform for us some of the work of fiction, reminding us, that is, of the truly mingled tissue of man's nature, and how huge faults and shining virtues cohabit and persevere in the same character.'

অর্থাৎ জীবনচরিতকার সাধারণতঃ সত্য-কথনে উদাসীন হইলেও এক্ষেত্রে যেন কতকটা উপন্যাসের কাজ করিয়াছেন, এবং আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে মানব-প্রকৃতি বড়ই জটিল, তাহাতে সমুজ্জ্বল গুণরাশির সঙ্গে নানা গুরুতর দোষ বিরাজ করে।